বাংলাদেশে বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প পন্থা ঃ সনাতন প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা

পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ

শীলা বিশ্বাস

রেজিঃ নং- ১০৮

সেশন ঃ ২০১০-১১

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল ২০১৫

বাংলাদেশে বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প পন্থা ঃ সনাতন প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়ক
ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

পিএইচ.ডি. গবেষক
শীলা বিশ্বাস
রেজিঃ নং- ১০৮
সেশন ঃ ২০১০-১১
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

উপস্থাপনের তারিখ ঃ এপ্রিল ২০১৫

উৎসর্গ

বাবা ও মাকে

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, শীলা বিশ্বাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে একজন পিএইচ.ডি. গবেষক। তার রেজিস্ট্রেশন নং- ১১৮ এবং শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০১০-২০১১। পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর দাখিলকৃত **"বাংলাদেশে বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প পন্থা ঃ সনাতন প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমি অনুমোদন করছি। আমার জানামতে ইতিপূর্বে কোথাও এই শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত হয়নি কিংবা কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।

(ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন)
তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, **"বাংলাদেশে বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প পন্থা ঃ সনাতন প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার এ গবেষণাকর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক অন্য কোথাও প্রকাশ করিনি কিংবা কোথাও প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করি নাই।

(শীলা বিশ্বাস)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণা কর্মটি সফলভাবে শেষ করতে পেরে আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি। কাজ করতে গেলে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। তবে একথা সত্য যে, গবেষক হিসেবে আমার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। গবেষণা কর্মটি সম্পাদনকালে আমি অনেকের কাছ থেকেই সহযোগিতা, পরামর্শ, নির্দেশনা ও উৎসাহ পেয়েছি, যা ছাড়া আমার পক্ষে গবেষণা কাজটি শেষ করা সম্ভব হতো না। এ প্রসঙ্গে আমি সর্বাগ্রে গভীর শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করতে চাই, আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কে। যিনি গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সকল সমস্যা ও প্রতিকূলতা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি আমার পাশে ছিলেন। পিএইচ.ডি. সেমিনার কার্য থেকে শুরু করে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের প্রশ্নমালা তৈরি, উপাত্ত সংগ্রহ সঠিক হচ্ছে কিনা মাঝে মাঝেই সে বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করা এবং সর্বোপরি তিনি আমার প্রতিটি অধ্যায়ই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে দিয়েছেন। তাঁর মতো একজন উদারমনা মানসিকতার অধিকারিনী মানুষের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে পেরে আমি সত্যিই খুব গর্বিত এবং কৃতজ্ঞ। আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের পরেই আমি কৃতজ্ঞ প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। তিনি আমাকে পিএইচ.ডি. কার্যক্রম সম্পন্ন করার অনুমতি প্রদান করেছেন। আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের লাইব্রেরি ব্যবহার, দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব জার্নাল, বই ও অভিসন্দর্ভ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি ছয় মাসের অধিক সময় মাঠ পর্যায়ে থেকে (জরিপ পদ্ধতিতে) তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মাদারীপুর জেলার কালকিনি

থানার ডাসার ইউনিয়নে অবস্থান করেছি। শুধু তাই নয়, ডাসার ইউনিয়নের পাশাপাশি আমার নিজস্ব ইউনিয়ন নবগ্রামেও থেকেছি বহুদিন। নিজস্ব ইউনিয়নে থেকে ওখান থেকে ৪০ কিলোমিটার পশ্চিমে এগিয়ে কোটালি পাড়া থানা। সেখানে গিয়ে কোটালি পাড়া থানার ভাঙ্গার হাট ইউনিয়নের মেয়ে এবং নবগ্রাম ইউনিয়নের ছেলের বিবাহ সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব নিয়ে কয়েক দফা সালিশে অংশগ্রহণ করেছি। মাদারীপুর জেলার লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশনের পরিচালক জনাব ফজলুল হক-এর সাথে অনেক বার সালিশ কার্যক্রম এবং মাঠ পর্যায়ের সামাজিক দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। তিনি আমাকে তাদের তৈরি বিভিন্ন জার্নাল, ভলিউম ও লাইব্রেরি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন এবং তাঁর অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আমাকে সহযোগিতা করার জন্য। ঢাকার লালমাটিয়ায় অবস্থানরত আইন ও সালিশ কেন্দ্রের লাইব্রেরি এবং তাদের সালিশ কার্যক্রম দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সেখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তাদের তৈরি বিভিন্ন পেপার কাটিং এবং জার্নাল আমার গবেষণার কাজে সহযোগিতা করেছে।

সর্বোপরি আমার গবেষণার মূল এরিয়া ডাসার ইউনিয়নের প্রতিটি মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রথমেই আমি আমার পূর্ব পরিচিত প্রাক্তন চেয়ারম্যান মনির চৌধুরীর নাম স্মরণ করছি। তিনি আমার পূর্ব-পুরুষদের সঙ্গেও পরিচিত। তিনি আমাকে প্রতিটি গ্রামের ওয়ার্ড মেম্বার ও মুরব্বিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ফোন করে আসার বিষয়টি তাদের সাথে আলাপ করিয়ে দেন, যাতে তারা আমাকে সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেন। পরবর্তীতে পরিচয় করিয়ে দেন স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের সাথে। সেই সাথে সাথে বর্তমান চেয়ারম্যান সবুজ কাজির ফোন নাম্বারও দিয়ে দেন। পরবর্তীতে তিনি আমাকে লিগ্যাল এইডের মাঠ কর্মী জনাব মোর্শেদা বেগম-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তারা আমাকে মাঠ-পর্যায়ের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে সাহায্য করেন। দর্শনা

গ্রামের একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বিমল নাগ আমাকে তাদের গ্রামের পূর্ব-বিচারিক প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে বর্তমান বিচারিক প্রক্রিয়া, হিন্দু আইন, মুসলিম আইন, বিভিন্ন সময় সালিশ সংক্রান্ত (সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের) পাওয়া ট্রেনিং নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমাকে আরো যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে উত্তরদাতারা অন্যতম। আমি তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান আমাকে একাডেমিক কমিটির সভা, সেমিনার কার্যক্রম এবং বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি আমি কৃতজ্ঞ প্রকাশ করছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কম্পিউটার অপারেটর জনাব মোঃ বসির আহমেদকে, যিনি আমার গবেষণার ভলিউমগুলো নিখুঁতভাবে টাইপ করেছেন এবং বই আকারে প্রকাশ করার জন্য পুরো থিসিসটাকে সাজিয়ে দিয়েছেন।

বাংলাদেশে বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প পন্থা ঃ সনাতন প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়নপত্র	ঃ		iii
ঘোষণাপত্র	ঃ		iv
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ঃ		v-vii
অধ্যায় ১	ঃ	**ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি**	**১-৫**
		১. ক. ভূমিকা	২-৪
		১. খ. গবেষণা পদ্ধতি	৪-৫
অধ্যায় ২	:	**বাংলাদেশের গ্রাম ও তার অধিবাসীগণ**	**৬-২৬**
		২. গ্রাম বাংলার মানুষ ও সমাজের বিবর্তন	৭-২৬
অধ্যায় ৩	ঃ	**ধারণাগত আলোচনা**	**২৭-৭৪**
		৩. ক. দ্বন্দ্বের উৎপত্তি	২৮-৩৬
		৩. খ. বিরোধ বা দ্বন্দ্বের অবস্থান	৩৬-৬১
		৩. গ. দ্বন্দ্বের শ্রেণীবিভাগ	৬১-৭২
		৩. ঘ. সামাজিক দ্বন্দ্বের কারণ	৭২-৭৪
অধ্যায় ৪	ঃ	**বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প পন্থা**	**৭৫-১০৭**
		৪. ক. বিকল্প পন্থার পরিচয়	৭৬-৮১
		৪. খ. বিকল্প পন্থার উৎস	৮১-৮৭
		৪. গ. ADR এর বিভিন্ন ধরন	৮৭-৯৩

৪. ঘ. বিভিন্ন দেশের অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা ৯৩-১০৭

অধ্যায় ৫ ঃ আলোচিত ইউনিয়ন ঃ ডাসার ১০৮-১২৯

৫. ক. ম্যাপ নং ১, ২, ৩ এবং ৪-এ যথাক্রমে মাদারিপুর জেলা, কালকিনি উপজেলা, ডাসার ইউনিয়ন এবং পাশ্ববর্তী নবগ্রাম ইউনিয়নের মানচিত্র দেখানো হয়েছে। ১০৯-১১৩

৫. খ. আলোচিত ইউনিয়ন ঃ ডাসার ১১৪-১২৯

অধ্যায় ৬ ঃ বিরোধ নিরসনে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ১৩০-১৯০

৬. ক. গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ১৩১-১৩৭

৬. খ. গ্রাম্য সালিশের ভূমিকা ১৩৭-১৫০

৬. গ. জ্ঞাতি ও গোষ্ঠীর ভূমিকা ১৫১-১৬১

৬. ঘ. মাতব্বর শ্রেণীর ভূমিকা ১৬২-১৭০

৬. ঙ. গ্রাম সমিতি ১৭১-১৭৪

৬. চ. ক্লাব কমিটি, যুবক শ্রেনী, দুর্মুজ কমিটি ১৭৪-১৭৯

৬. ছ. কাজী মওলানা মুফতি, ইমাম ও পুরোহিতদের ভূমিকা ১৭৯-১৮৭

৬. জ. সুপারিশ ১৮৭-১৯০

অধ্যায় ৭ ঃ মূল্যায়ন ১৯০-২০৩

পরিশিষ্ট – ১ (প্রশ্নপত্র) ২০৪-২০৫

পরিশিষ্ট – ২ (চেক লিষ্ট) ২০৬

পরিশিষ্ট – ৩ (গ্রন্থপঞ্জি বাংলা) ২০৭-২০৯

পরিশিষ্ট – ৪ (Bibliography) ২১০-২১৩

পরিশিষ্ট – ৫ (পত্রিকা এবং জার্নাল) ২১৪

অধ্যায় ১

ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি

১. ক. ভূমিকা

বাংলাদেশ গ্রাম এবং কৃষি প্রধান দেশ। বেশিরভাগ লোকই গ্রামে বাস করে। বিভাগ পূর্ব ও বিভাগোত্তরকালে বাংলাদেশের প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষ গ্রামের অধিবাসী। তারা হাজার হাজার বছর ধরে প্রচলিত কৃষি-জীবনে অভ্যস্ত। ক্ষুদ্র কৃষক, বর্গাচাষী, ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন, জেলে, তাঁতী, গোয়ালা, কামার, কুমার, ছুতার প্রভৃতি মানুষের এক বিপুল শ্রেণী কৃষি জীবনের বৃত্তে বসবাসরত (আজিজ ২০০১, পৃ : ১৬৪)। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য - পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ার পরে সহসা ঢাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলেও জীবন যাত্রার মান থেকে যায় মুখ্যত পূর্বের গ্রামীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঘটনার ঘনঘটা থাকলেও পূর্ববাংলার সমাজ জীবনের বৃহত্তর অংশের সামাজিক অবস্থান প্রায় একই থেকে যায়। যে সমাজ কাঠামোয় বাংলাদেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গের উদ্ভব, তাতে চিরকাল কর্তৃত্বধারী ভূম্যধিকারী শ্রেণী। সমাজবিজ্ঞানী আন্দ্রে বেতেই-র সমাজ বিশ্লেষণ অনুসরণকালে দেখা যায়। কৃষিভিত্তিক সমাজে ভূমির গুরুত্ব সর্বাধিক, ভূমিই সেখানে সর্বময় সম্পদের উৎস। ভূমির অধিকারীই সেখানে নিয়ন্ত্রন করে বস্তু ও ব্যক্তি উভয়কেই।

"কৃষিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে সমাজ দীর্ঘর্কাল ধরে প্রচলিত আছে তার প্রকৃতিই এ অঞ্চলের মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ করে রেখেছে" (হোসেন, ১৯৯২, পৃ : ৯৯)। "অবৈজ্ঞানিক কৃষি ব্যবস্থা উৎপাদনের যে অন্তরায় সৃষ্টি করে তাকে এরা মোকাবেলা করে জনশক্তি দিয়ে। সমবায়ী জীবনই এই জনশক্তির উৎস" (প্রাগুক্ত)। "জমি কর্ষণের সময়ে একই সঙ্গে অনেক জোড়া গরু ও হালের প্রয়োজন, ফসল কাটা, ফসল মাড়াই, নদীতে খালে বাঁধ দিয়ে বন্যা রোধ

বিশেষ ক্ষেত্রে মাছ ধরা প্রভৃতি গ্রাম জীবনের সকল অর্থনৈতিক কাজই এদের সম্মিলিত অংশগ্রহণ লক্ষ্যণীয়। উৎপাদনশীল কাজকর্মে যৌথ অংশগ্রহণ ছাড়াও পরস্পরের বিপদ-আপদ, উৎসব-অনুষ্ঠান, জন্ম-মৃত্যু সকল ক্ষেত্রেই গ্রামীণ মানুষকে যুক্ত জীবন-যাপন করতে দেখা যায়। বাংলার গ্রামীণ মানুষের এই মুখবদ্ধ আর্থ-সামাজিক জীবনের চিত্র অত্যন্ত জীবন্ত ও বস্তুনিষ্ঠ। যদিও গ্রামীণ জীবনে পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা ও প্রীতি-সোহার্দ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে, তথাপি এদের সমাজে বিদ্বেষ ও সংঘাতের পরিমাণ কম নয়। জমি দখল, চর দখল নিয়ে লড়াই, কখনও কখনও প্রেম, বিবাহ, খেলাধুলা, গান-বাজনা সমাজের বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে গ্রামের সমস্ত জীবন কলহে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। গ্রামের মাতব্বর জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, কৃষক, ব্যবসায়ী, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সর্বক্ষণই লেগে আছে" (প্রাগুক্ত)।

"গ্রামীণ সমাজে জ্ঞাতিদের মধ্যে ঝগড়া-দ্বন্ধ বিরল ঘটনা নয় বরং তা সচরাচরই চোখে পড়ে। সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা, সমাজ-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি অর্থনৈতিক লেনদেন, গৃহপালিত পশু-পক্ষীর দ্বারা ফসলের ক্ষতিসাধন ইত্যাদি। গ্রামের ঝগড়ার একটা প্রধানতম বিষয় হচ্ছে সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা। এসব দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য গ্রামে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন ঃ সালিশ সমাজ, ইউনিয়ন পরিষদ, মসজিদ কমিটি, মন্দির কমিটি, বাজার কমিটি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রভৃতি" (মহিউদ্দিন ১৯৯১, ৮৩)।

"আধুনিক আদালতসমূহ বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও গ্রামীন সমাজের দ্বন্দ্ব-কলহ মিটাতে এসব আদালত যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে না" (রহমান, ১৯৮৯, ৬৩)। এক্ষেত্রে গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলো একান্ত গ্রাম্য জীবনের অনুভূতি দিয়ে বিচারকার্য সমাধান

করে থাকে এবং তা গ্রামের জনগণ সুন্দরভাবে মেনে নেয়। এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশের বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প পন্থা ঃ "সনাতন প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা" শিরোনামে আমি এই গবেষণায় সনাতন প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১. খ. গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি প্রধানত বিশ্লেষণধর্মী। এ গবেষণায় মূলত: প্রাথমিক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে একটি ইউনিয়ন থেকে। গ্রাম জীবনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, পর্যবেক্ষণ ও সব ধরনের লোকের সাথে খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সার্বিক তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে যে প্রাথমিক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে তা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই নির্ধারিত করা হয়েছে গবেষণার সুবিধার জন্য। গ্রাম পর্যায়ে এসব গবেষণার জন্য গবেষণার ক্ষেত্রের সাথে গবেষকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা একটি বড় সুবিধা আছে। এ গবেষণার ক্ষেত্রে যে ইউনিয়নটি বেছে নেয়া হয়েছে তা গবেষকের নিজস্ব জেলার ইউনিয়ন। একটি প্রশ্নমালা প্রয়োগের এবং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন-এর মাধ্যমে নির্ধারিত ইউনিয়নটির ১৪টি গ্রাম থেকে ৫০টি করে পরিবার বেছে নিয়ে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে (Random Sampling) উত্তরদাতার মতামতের ভিত্তিতে জনমত জরিপের মাধ্যমে কাজটি সম্পাদন করা হয়েছে। তাছাড়া ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান যেমন- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মসজিদ মন্দিরের সেবাইত, গোষ্ঠী প্রধান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে, বিভিন্ন সমবায়-সমিতির সদস্যদের সাথে, বিচার সংক্রান্ত কাজে জড়িত বাংলাদেশে বিভিন্ন

এনজিও'র মাঠকর্মী, সুপারভাইজার ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য ছয় মাস সময় ব্যয় করা হয়েছে।

সেকেন্ডারী তথ্য ঃ এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত দেশ-বিদেশে প্রকাশিত বই-পুস্তক, গবেষণা-জার্নাল, সেমিনার-ওয়ার্কশপ, রিপোর্ট, পত্র-পত্রিকা সাময়িকী ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত গ্রন্থ, গবেষণা কর্ম, রচনা, প্রবন্ধ, সরকারি দলিল, জার্নাল ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি তথ্য-উপাত্ত দলিলের অধ্যায়ভিত্তিক সূত্র ও বইয়ের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

অধ্যায় ২

বাংলাদেশের গ্রাম ও তার অধিবাসীগণ

২. গ্রাম বাংলার মানুষ ও সমাজের বিবর্তন ঃ

রাষ্ট্র হিসেবে নতুন হলেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচারে বাংলাদেশ বেশ প্রাচীন। আর সেই প্রাচীনত্বে ছিল উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য। যথাযথ উপাদানের অভাবে প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস আজও অনেকটা অস্পষ্ট। এদেশের ইতিহাস রচনার অন্যতম প্রধান একটি উপাদান লেখমালা। তবে লেখমালার বেশিরভাগ ছিল রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত।

গ্রিক দার্শনিক Socrates (সক্রেটিস) বলেছেন æKnow thy self" অর্থাৎ নিজেকে জান। বর্তমান বিশ্ব সক্রেটিসের এই বক্তব্যকে দিয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব। উন্নত বিশ্বের মানুষেরা এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যক্তি, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনকে গড়ে তোলার নিয়ত প্রয়াসে লিপ্ত। বাংলার বৃহত্তর সমাজকেও সম্যকভাবে উপলব্দি করার প্রথম শর্ত সমাজের ক্ষুদ্রতর ভিন্ন ভিন্ন অংশকে যথাযথভাবে বোঝা ও সঠিকভাবে উপলব্ধি করা।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে লেখমালাভিত্তিক গবেষণা কর্মের সূত্রপাত প্রথম শুরু হয় রাজশাহীর বরেন্দ্র রিচার্স সোসাইটি ও কোলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে। এ বিষয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখ্য হলো অক্ষয় কুমার মিত্র, ননীগোপাল মজুমদারের æInscriptions of Bengal" ৩য় খণ্ড (রাজশাহী ১৯২৯), পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের "কামরূপ শাসনাবলী" (রংপুর ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ), কমলাকাণ্ড গুপ্তের æCopper-plates of Sylhet" (সিলেট ১৯৬৭), আর আর মুখার্জি ও এস কে সাইতি সম্পাদিত æCorpus of Bengal

Inscriptions" (কোলকাতা ১৯৫৭), দিনেশ চন্দ্র সরকার রচিত æEpigraphic Discoveries in East Pakistan" (কোলকাতা ১৯৭৩) এবং সুপ্তিকণা মজুমদার, বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজ, পৃ. ৬।

বাংলাদেশের সমাজ মূলত কৃষিসমাজ এবং গ্রামই হলো এই সমাজের মৌলিক সামাজিক সংগঠন। কাজেই গ্রামের সামাজিক কাঠামোর যথোপযুক্ত সমীক্ষা ব্যতীত গ্রামীণ বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, মাত্র কয়েকটি গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাম সম্পর্কে তথ্যাদি পাওয়া যায়। তাদের দুইটি গবেষণা খুবই উল্লেখযোগ্য আর তা হলো রামকৃষ্ণ মুখার্জীর Six Villages of Bengal (১৯৭১) এবং এ কে. নাজমুল করিমের Changing Society of India and Pakistan (১৯৫৬)। এতেও সমস্যা রয়েছে। এ গ্রন্থ দুটিতেও বহু পূর্বের সমাজ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে উক্ত সমাজ ব্যবস্থায় বহুবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

এ বিষয়ে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই যে, একটি বিশেষ গ্রামের সামাজিক কাঠামোর গবেষণা দ্বারা সমগ্র গ্রামীণ বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থার সার্বিক প্রতিচ্ছবি পাওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য প্রয়োজন বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে এরকম সম্ভাব্য বহুসংখ্যক গ্রামের উপরে গবেষণা চালানো। গ্রামীণ ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন আমরা তার সাথে একমত। দুবে বলেছিলেন, আজকের দিনে প্রয়োজন হলো নানাবিধ সংগঠন ও নৈতিক আদর্শাবলীর বিভিন্নতার বিন্যাস সম্বলিত যে গ্রামীণ সম্প্রদায়সমূহ দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের বিষয়ে অজস্র গবেষণা।

রামকৃষ্ণ মুখার্জী তার Six Villages of Bengal গ্রন্থে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে যে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের লোক রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, গ্রামের হিন্দু জনসাধারণ প্রধানত বর্ণ হিন্দু ও তফসিলী হিন্দু এই দু'ভাগে বিভক্ত। বর্ণ হিন্দুরা আবার সামাজিক মর্যাদা অনুসারে উচ্চ ও মধ্য বর্ণে বিভক্ত। পক্ষান্তরে মুসলমান জনসাধারণ শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতা অনুসারে সাধারণ মুসলমান ও কলু মুসলমান এই দু'ভাগে বিভক্ত। সাধারণ মুসলমানেরা কলু মুসলমানদের সামাজিকভাবে নিকৃষ্টতর মনে করে। ফলে কলুরা প্রধানত অন্তর্বাহিক দল হিসাবেই বিরাজ করে যদিও এদের মধ্যে পংক্তিভোজন নিষিদ্ধ নয় (প্রাগুক্তঃ ২৩৯) মুখার্জী তার Six Villages গ্রন্থে বগুড়ার যে ছয়টি গ্রামের আর্থ-সামাজিক জীবন উল্লেখ করেছেন, তাতে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের এই অঞ্চলে উচ্চজাতি বর্ণ, মধ্যজাতি বর্ণ ও তফসিলী হিন্দু কিংবা উচ্চ ও নিম্ন বর্ণে বিভক্ত মর্যাদার মুসলমান সকলেই মোটামুটি তাদের পারস্পারিক অর্থনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ [ওয়াইজ, জেম্‌স, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ]।

নাজমুল করিমের গ্রন্থটি ভারত ও পাকিস্তানের সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক স্তর বিন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্যাদির তাত্ত্বিক সমীক্ষা। পূর্ব পাকিস্তানের কথা এখানে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। তাঁর গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছদে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের বর্তমানকালের একটি সাধারণ গ্রাম নয়নপুরের সঙ্গে ষোড়শ শতকের উক্ত গ্রামের তুলনামূলক সমীক্ষা করেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে নয়নপুরের বর্তমান সামাজিক কাঠামো ও স্তরবিন্যাস তুলে ধরেন।

নয়নপুর মূলত মুসলমান অধ্যুষিত। মোট জনসংখ্যার মাত্র পাঁচ শতাংশ হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। করিমের মতে, নয়নপুরের জনসাধারণ নিম্নোক্ত প্রকারের অধ্যারোপিত শ্রেণী ও দলে বিভক্ত।

১। চৌধুরী বংশ ঃ যারা নিজেদের একদা গ্রামের সামন্ত প্রধান ছিল বলে দাবী করে।

২। খন্দকার বংশ ঃ যারা নিজেদের যাজক/পুরোহিত সম্প্রদায়ভুক্ত বলে দাবী করে।

৩। মুহুরী বংশ ঃ যারা নিজেদের লিখক (দলিল লিখক প্রভৃতি) সম্প্রদায়ভুক্ত বলে দাবী করে।

৪। ভূঁইয়া বংশ ঃ সম্পন্ন সত্ত্বাধিকারী কৃষক।

৫। চাষী বংশ ঃ যাদের চাষাবাদযোগ্য নিজস্ব জমি আছে।

৬। ভূমিহীন কৃষি মজুর।

৭। অন্যান্য ধরনের দিন মজুর।

৮। কাঠুরিয়া।

৯। চাকর বা গোলাম ঃ যারা একদা ক্রীতদাস ছিল (করিম, ১৯৫৬, ১৬০-৬১)। নয়নপুরের হিন্দুরা (১) কুমার (২) ছুতার (৩) তাঁতী (৪) ধোপা এইসব শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

করিম লক্ষ্য করেছেন যে, চৌধুরী বংশের সাথে খন্দকার বংশের বিবাহাদি হলেও চৌধুরী বংশের সাথে মুহুরী বংশের তৃতীয় কিংবা ভূঁইয়া বংশের মধ্যে তা সচরাচর ঘটে না। করিমের মতে নয়নপুর গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যকার এই সম্পর্ক দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ফলে গ্রামবাসীরা এখনো যথেষ্ট মাত্রায় শ্রেণী সচেতন হওয়া সত্ত্বেও আন্তশ্রেণী বিবাহাদি এখন প্রায়শই ঘটছে।

বাংলাদেশের একটি হিন্দু প্রধান গ্রামের (সাহাবাদ) পরিবার ও জ্ঞাতি সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে বেসাইনে একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ গ্রামের সকল অধিবাসী নিজেদের নমশূদ্র বলে বর্ণনা করে। নমশূদ্ররা সনাতন হিন্দু জাতিবর্ণ প্রথায় অন্তজ জাতিবর্ণের অন্তর্গত এবং সমকালীন বাংলায় জল অচল ও অস্পর্শ স্তরের অন্তর্গত। অবশ্য নিজেদের উচ্চবর্ণে অভিসিক্ত করার মানসেই তারা শূদ্র মর্যাদার দাবী করে যা আসলে "সংস্কৃতিকরণ" (শীনি-বাস) প্রকৃতিরই ইঙ্গিত বই।

পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো অবশ্য মিশ্র প্রকৃতির যেখানে হয় হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের জনসাধারণ রয়েছে অথবা কতিপয় উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দু জনসাধারণ রয়েছে। একটিমাত্র বর্ণ বেসাইনে লিখেছেন ঃ (Single caste) এবং প্রকৃতপক্ষে একটিমাত্র ধর্মীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রাম হিসেবে সাহাবাদ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও তা ব্যাতিক্রমধর্মী কিছু নয় (বেসাইনে, ১৯৬৩ ঃ ৭), (চৌধুরী পৃ. ১৬)।

Hafeez Zaidi (১৯৭০) ষাটের দশকে কুমিল্লা জেলার দু'টি গ্রামে সমীক্ষা চালান। উক্ত গ্রামদ্বয়ের অন্যতম রামনগর সম্পূর্ণভাবে মুসলমান অধ্যুষিত এবং অপরটি আলিমপুরে হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম গোষ্ঠীর জনগণ বসবাস করে। জায়দি প্রথমত গ্রামের সাধারণ বর্ণনা দিয়ে শুরু করেছেন এবং ধীরে ধীরে গ্রামের পারিবারিক কাঠামোর আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন।

গ্রামের পরিবারগুলি প্রধানত বর্ধিত ধরণের, যেখানে দুই বা ততোধিক পুরুষ একত্রে বাস করে। সমস্ত প্রকার সামাজিক কার্যক্রমের ভিত্তি এখনো একান্নবর্তী পরিবার। বয়োবৃদ্ধ সদস্যই সাধারাণত

পরিবারের প্রধানরূপে পরিগণিত হন। সন্তান-সন্ততি, সহায়-সম্পত্তি কিংবা বিবাহাদি বিষয়ে তার মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। জ্ঞাতি সম্পর্কের বন্ধনই হলো গ্রাম দু'টির সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি। এমনকি তা সামাজিক সাংস্কৃতিক সম্পর্কেরও ভিত্তি।

বাংলাদেশের অন্য আর একজন সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ক গবেষক হেলাল উদ্দিন খান আরেফিন তার নৃতাত্ত্বিকমূলক গবেষণা-শিমুলিয়া বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল কৃষি কাঠামো নামক গ্রন্থে গ্রামের জনবসতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে শিমুলিয়া গ্রামের প্রথম বসতি স্থাপনের সময়কালে হিন্দু ও মুসলমানদের কেউই ভদ্রলোক শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত হত না। ১৯১২-১৯১৫ গ্রামনোটে উল্লেখ আছে "এ মৌজায় বসবাসকারী হিন্দু বা মুসলমানদের মধ্যে কোন ভদ্রলোক শ্রেণী ছিল না।" বস্তুত, শিমুলিয়ার মুসলমান ও হিন্দুদের অবস্থান ছিল সমাজের নিচু স্তরে। গ্রামের মুসলমান অধিবাসীরা মূলতঃ পেশায় ছিল তাঁতী- যারা জামদানী ও কাসিদা শিল্পে কাজ করত। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মুসলমান সমাজের উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, তাঁতীরা পেশাগত গোষ্ঠী হিসেবে সবসময় সামাজিকভাবে নিচু অবস্থানে ছিল। সাধারণভাবে তারা 'জোলা' হিসেবে পরিচিত। ২২টি মুসলমান পিতৃবংশের মধ্যে ১৮টি গোষ্ঠীই এভাবে জামদানী ও কাসিদা শিল্পের সাথে জড়িত ছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা শুধুমাত্র দরিদ্রই ছিল না বরং পেশায় তাঁতী ছিল বলে তারা নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত হত এবং সাধারণত এ তাঁত পেশার জন্য তাঁরা দক্ষিণ এশিয়া সমাজে নিচু শ্রেণী হিসেবে গণ্য হত। শিমুলিয়ার হিন্দুরা ছিল নমশূদ্র শ্রেণীর অর্থাৎ তাদের পেশা ছিল মাছধরা। শিমুলিয়ার হিন্দু ক্রমোচ্চ বিন্যাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে লক্ষ্য করেছেন যে, হিন্দুদের অর্ধেকেই ছিল জেলেদাস শ্রেণীর (যদিও এটা স্বীকার করার ব্যাপারে বেশ ইতস্ততা ছিল- অর্থাৎ তাদের মূল পেশাই ছিল মাছ ধরা। হিন্দু জনসংখ্যার বাকী অর্ধাংশ নিজেদের "মাহিষ্য চাষী" বলে দাবী করে যাদের

পেশা হচ্ছে চাষাবাদ। তারা তাদের মত (শৌচ) শূদ্র (সবচেয়ে নিচুবর্ণ হিসেবেও দাবী করে। মাহিষ্য চাষী গোষ্ঠী নিজেদের শূচী ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে এবং অন্যান্য হিন্দুদের তাচ্ছিল্যের সাথে অশূচী "নম" শ্রেণীর বলে দাবী করে। সম্ভবতঃ মাহিষ্য চাষী শ্রেণীর হিন্দুরাও আগে অশূচী জেলে শ্রেণী থেকে এসেছিল এবং কংস নদী ভরাট হবার পর এই জনগোষ্ঠী তাদের মাছধরা পেশার পরিবর্তন ঘটিয়ে ক্রমান্বয়ে চাষাবাদ শুরু করে। এভাবে ধীরে ধীরে নিজেদের "মাহিষ্য চাষী" বলতে শুরু করে। বর্তমান হিন্দু ভূ-মালিকদের অধিকাংশের পূর্ব পুরুষই ছিল এই- "মাহিষ্য চাষী" (হেলাল উদ্দিন খান, আরেফিন-২১, শিমুলিয়া গ্রাম)।

ভারত বিষয়ক নৃতাত্ত্বিক ইংরেজ সিভিলিয়ন Alfred Lyal (১৮৩৫) অবদান অনেকেই স্বীকার করেছেন। ভারতীয় সমাজ কাঠামোর ভিত্তি তিনি জানতে চেয়েছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং তার মতামত সরকারি অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করেছি। লায়াল সবসময় ভারতীয় সমাজ কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে বর্ণ ও ধর্মকে মাপকাঠি হিসেবে ধরেছিলেন। তাঁর মতে ভারতীয় সমাজের চাবিকাঠিই হলো ধর্ম। শুধু তাই নয় বৃটিশ শাসনের স্বার্থে এগুলিকে অক্ষুন্ন রাখা উচিৎ। এক প্রবন্ধে (১৮৭২) এই তত্ত্ব আর একটু বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে লিখেছিলেন, ভারতের চব্বিশ কোটি লোক রক্ত বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত (জেমস ওয়াইস, ১৯৯৮, পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জাতি-বর্ণ ও পেশার বিবরণ, পৃ. ১৫)।

Wise James মুসলমান সম্প্রদায়েও জাতপাতের অস্তিত্ব আছে বলে দেখিয়েছেন। ১৯১১ সালের আদম শুমারিতে মুসলমানদের "শেখ", "সৈয়দ" প্রভৃতি ৮০টি জাতিতে বিভক্ত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে "শেখ", "সৈয়দ", "মীর" জাতিগত পার্থক্য বোঝায় না। এগুলো মূলত উপাধি হিসেবে

বয়োবৃদ্ধ, বিদ্বান, ধার্মিক ও সচ্চরিত্র মুসলমানগণের সম্মানার্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। ওয়াইজ উল্লেখ করেছেন মুসলমান সম্প্রদায় নানাভাবে বিভক্ত। এক্ষেত্রে তিনি শিয়া সুন্নি, ফরাজি, ওহাবি- এসব উপরিভাগে উল্লেখ করেছেন যা কোন অর্থে "জাতি" নয়। আবার আজরফ, আতরফ ও জাতিজ্ঞাপক কিছু নয়। বরং তা শ্রেণীগত পার্থক্য। এ ভেদ এখনও বর্তমান। ঊনিশ শতকের শেষার্ধে যখন মুসলমান চাষীরা পাটচাষের ফলে নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করেছিলেন বা কেউ হঠাৎ সম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন তখন বিদ্যমান সমাজে নিজের স্থান উঁচু করে দেখাবার মানসে "খান", "পাঠান", "সৈয়দ" শব্দগুলি নিজের নামের পাশে লাগাতেন। এখনও এ ধারা একেবারে বিলুপ্ত এ কথা বলা যাবে না। হিন্দুবর্ণাশ্রম বা জাতি ব্যবস্থা মুসলমান সমাজে প্রযোজ্য নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে শিয়া আধিপত্য লোপ পায়। পূর্ববঙ্গে সুন্নিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বর্তমান বাংলাদেশে সুন্নিরা মূলতঃ ৪টি গোত্রে বিভক্ত (১) সাবেকি, (২) ফরাজি (৩) তাইয়নি (৪) রাফিইয়াদায়িন (ওয়াইজ, ১৯৯৮, পৃ. ১৮)।

অন্যান্য দেশের মুসলমানদের সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের একটি বড় পার্থক্য হল পীর বা বুজুর্গ ব্যক্তিদের উপর অন্ধবিশ্বাস। পূর্ববঙ্গে এদের সংখ্যা অগণিত। নিচে বিখ্যাত কয়েকজন পীরের নাম উল্লেখ করা হল।

সিলেটের শাহ জালাল মুজররফ ইয়ামেনি।

পাঞ্জ পীর

মুন্না শাহ দরবেশ।

খন্দকার মোহাম্মদ ইউসুফ।

মীরপুরের শাহ আলি বোগদাদি।

চট্টগ্রামের পীরবদর আউলিয়া।

ঢাকার শাহ জালাল দক্ষিণী।

বিক্রমপুরের আদম শহীদ (ওয়াইজ, ১৯৯৮, পৃ. ৩২)।

প্রতি বছর শতশত লোক এই পীরদের মাজার দর্শনে যান হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। ভক্ত হিন্দু তীর্থযাত্রীরা জগন্নাথের মন্দির কিংবা বৃন্দাবনে তীর্থ করতে গেলে যেরকম কষ্ট ভোগ করেন, অনেকটা সেইরকম কষ্টভোগ করে পীরদের মাজার দর্শন করতে হয়। গুরু ও গোঁসাই এর উপর হিন্দুদের যেমন অন্ধভক্তি, পীরদের উপর মুসলমানদের ভক্তির মাত্রা তারচেয়ে বেশি নাহোক, কম তো নয়ই। পীরদের অলৌকিক ক্ষমতার উপর মুসলমানদের অগাধ বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করে রোগব্যাধি থেকে নিরাময় লাভ করা, কিংবা অলৌকিক ক্ষমতায় বন্ধ্যা স্ত্রী লোকের সন্তান লাভ, এসব পীরদের কেরামতিতে সম্ভবপর ব্যাপার। সিলেটের জগন্নাথপুরের শাহ করম আলি যে, মৃত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন কিংবা ইচ্ছামত বৃষ্টি নামাতে পারেন, এসব ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না তাদের। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমানরা এগুলো বিশ্বাস করতেন। ঈশ্বর যে সব ক্ষমতার অধিকারী, কল্পনাতীত হলেও কখনও কখনও মানুষ যে সেসব ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে, এ কথা অকুণ্ঠভাবে তারা বিশ্বাস করতেন। ভারতীয় প্রথা অনুযায়ী পীরের নিকটস্থ হলে মুরিদরা আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ তাকে তসলিম জানান বা কুর্নিশ করেন। আরব ও বিদেশি মুসলমানদের কাছে এ হল গর্হিত অপরাধ।

বঙ্গদেশে মুসলমানরা যে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশায় নিয়োজিত আছেন সেগুলো জানলে এই অঞ্চলে মুসলমানদের বাস এবং পেশা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

১। বহুরূপীয়া ঃ বহুরূপীয়রা প্রধানত ধর্মান্তরিত মুসলমান। এরা কোন একটি মানব চরিত্রের অনুকরণে নাচে ও গায়, ঢোল ও মন্দিরার বাজনার সঙ্গে নাচগান করে।

২। বাজুনিয়া ঃ একদল বাদক ঢাকায় এখনো বেশ জনপ্রিয়। আগে এদের সংখ্যা বেশি ছিল। জিন্দা শাহ্ গাজি- কা গায়েন বলে এরা পরিচিত। জিন্দা শাহের উদ্দেশ্যে এরা বাংলা ও হিন্দিতে গান গাইতেন। বৈঠক পেতে এরা পেতেন দু'টাকা।

৩। বলদিয়া ঃ বলদিয়ারা মুসলমান। কয়েক জোড়া বলদ থাকে এদের। যেসব জায়গায় পাকা রাস্তা নেই। সেখান থেকে বলদের গাড়িতে করে ইট, পাথর ও খাদ্যশস্য বহন করা এদের কাজ।

৪। ভাটিয়ারা ঃ ভাটিয়ারাকে বলা যেতে পারে হয় মুদি নইলে দোকানদার, আর না হয় ভোজনালয়ের ব্যবস্থাপক।

৫। চামড়া ফরোশ ঃ ঢাকা হলো চামড়া ব্যবসার জমজমাট কেন্দ্র। চামড়া ব্যবসায়ীরা গোঁড়া সম্প্রদায়ের মুসলমান। সাধারণত এরা কুট্টি শ্রেণীর। কুট্টিরা আবার হয় ফরাজি কিংবা ওহাবি। বাজার যখন মন্দা থাকে তখন এরা রাজমিস্ত্রির কাজ করে।

৬। চন্ডুওয়ালা ঃ চন্ডুওয়ালারা ঢাকায় আফিমের ব্যবসা করেন।

৭। চওন্‌রি ঃ ওয়ালা মাছি তাড়াবার জন্য তালের পাখা ও মর্যাদাকর কাজে ব্যবহারের জন্য চামর দুই ধরনের জিনিসই সে বানায়।

৮। ছিপি গর ঃ কাপড়ে যারা নকশার ছাপ দেয় তাদের ছিপি গর বলে।

৯। চিকনদোজ ঃ মস্‌লিনে সূতা দিয়ে যারা নকশা তোলে তারা হল চিকনদোজ।

১০। চুড়িওয়ালা ঃ চুড়িওয়ালারা বিভিন্ন রং-এর কাঁচের মালা তৈরি করে।

১১। দফাদার ঃ এদের নারী-পুরুষ ধানের বীমা বানায় ও মোটা মাদুর বানায়। এরা এগুলো বানায় নলখাগড়া দিয়ে যেগুলো সুন্দরবন থেকে নিয়ে আসে।

১২। দাই ঃ দাই শব্দটি সংস্কৃত ধাই শব্দ থেকে এসেছে। ধাই অর্থ হল দুধ-মা। ধাত্রীরা সাধারণত মুসলমান।

১৩। দরবেশ ঃ এরকম উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত মোহাম্মদের (দ:) ইন্তেকালের কিছুকাল পর থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর দরবেশের উদ্ভব ঘটে। প্রচলিত ঐতিহ্য অনুযায়ী, একই ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী ঐক্যবদ্ধ ও অনুগতব্যক্তি আন্তরিকতার সঙ্গও একই নিয়মনীতির ভিত্তিতে যে ঈশ্বরের আরাধনা করেন তারাই হল দরবেশ। এই অঞ্চলে দরবেশদের যে শ্রেণী বিভাগ দেখা যায় তারা হলেন কাদিরিয়া, চিশতিয়া, শাত্তারিয়া, সাদারিয়া, রাফাই, জালা-লিয়া, সোহাগিয়া, নকশা বন্দিয়া, বাওয়া পিয়ারি কা ফকিরান।

১৪। দর্জি ঃ দর্জির পেশা অত্যন্ত মর্যাদাকর। লোকে সাধারণত: তাদের খলিফা কিংবা কারিগর বলে ডাকে। মুসলমানদের প্রায় সবাই দর্জির কাজ জানেন। গরিব মানুষের কাজ না থাকলে সে দর্জি বনে যায়। দর্জি আছে বেশ কয়েক রকম। যেমন- বাজারি দরজি, কিংবা যারা বানানো পোষাক ফেরি করে বিক্রি করেন, কিংবা টুপিওয়ালা অর্থাৎ যারা টুপি তৈরি করেন কিংবা কাপড় সেলাই করেন অর্থাৎ সাধারণ দর্জি। দৈনিক মজুরি সাধারণত: চার থেকে আট আনা। কিন্তু রেওয়াজ অনুযায়ী তারা বেতন পান মাসিক। তারা আবার চুক্তির কাজ করেন বাড়িতে। বিধবা ও দরিদ্র মেয়েরা বড় দরজির দেওয়া কাজ বাড়িতে বসে করেন।

১৫। দস্তর বন্দ ঃ এটা একেবারেই মুসলমানদের পেশা। হিন্দুরা এই পেশায় নেই। দস্তরবন্দ পাগরিবন্দ হিসেবেও পরিচিত।

১৬। দস্ত ফরোশ ঃ যারা পুরনো কাপড়চোপড় বেচা-কেনা করেন।

১৭। ধারি ধারাই ধারাইন ঃ যারা দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বিক্রি করেন।

১৮। ধোবি ঃ যারা মিস্তারি ও ইস্ত্রিওয়ালা হিসেবে পরিচিত।

১৯। ধুনিয়া ঃ যারা তুলা পরিষ্কার করে।

২০। ফালুদা ঃ ওয়ালা হরেক রকম শরবত পাওয়া যায়।

২১। গোয়ালা ঃ দুধ বিক্রির ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানরা সংস্কারমুক্ত।

২২। হাফিজ ঃ কোরান যিনি মুখস্ত বলতে পারেন তিনি হলেন হাফিজ।

২৩। হাজ্জাম ঃ অন্যদেশের মত চিকিৎসা শাস্ত্র ও শল্য চিকিৎসার সঙ্গে হাজ্জামদের সম্পর্ক ছিল।

২৪। হাকিম ঃ মুসলমানি চিকিৎসা ব্যবস্থা যা সাধারণত ইউনানী ও গ্রীক চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসেবে সুপরিচিত।

এছাড়া আছে- হাক্কাক, হালুয়াই হাওয়াই গার, জিলদগার, জোলা, জুতি-ওয়ালা কাহ্হাল, কাগজি, কালওয়ার, কসাই, কথক, খোন্দকার, কোফত-গার, কলু, কুঙ্গকার, কৃঞ্জরা, কুট্টি, লাকড় হারা, লোহার, মদদওয়ালা মাহি, ফরোশ, মাদুত, মালি, মিরাসান, মিশি ওয়ালা, মুকাররির, মোল্লা মুন্শি, মুরগিওয়ালা, মুর্গাবান, নৈচাবন্দ, লালবন্দ, নানবাই, রঙটিওয়ালা, নারদিয়া, নিলগর, ওঝা, পনিরওয়ালা, পাঙ্খাওয়ালা, সাইকালগার, শালগার, শিয়া, শিকারি শিশাগর, তাঁতী, তারওয়ালা, টিকাওয়ালা প্রভৃতি। এদের মধ্যে যেসব পেশায় বেশী লোক দেখা যায় তারা হলেন-

- তাঁতী ঃ তাঁতীরা বানায় জামদানী, নকশা তোলা কাপড়, আর জোলারা বানায় মোট। মসলিন, তাঁতীদের জোলা বললে ভীষণ চটে যায়। কারিগর কিংবা জামদানী তাঁতী বললে খুশী হয়।

- শিকারি ঃ মুসলমানরা শিকারে আমোদ। প্রায়ই দেখা যাবে তারা ঘুঘু, বক ও বিলে পড়া হাঁসের ঝাকে বন্দুক তাক করে আছে। হরিণ শিকার করছে। ধনী সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মধ্যে এমন পরিবারের অভাব নেই যাদের হাতে দু'একজন শিকারি নেই।
- শিয়া ঃ আগেকার দিনে পূর্ববঙ্গে বড় বড় সব ভূ-স্বামীরা ছিল শিয়া। এদের সংখ্যা ও প্রভাব দুটোই কমেছে। আজকাল মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এরা একটি ক্ষুদ্র অংশ।

বাংলাদেশের গ্রামগুলোর অধিবাসীগণের সামাজিক পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে ধর্ম বা বর্ণ প্রথার যেমন একটা ভূমিকা রয়েছে তেমনি আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভর করেও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে।

রামকৃষ্ণ মুখার্জীর Six Villages of Bengal বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত বগুড়া জেলায় ছয়টি গ্রামের আর্থ-সামাজিক জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে গ্রামগুলোর অর্থনৈতিক ক্রমোচ্চবিন্যাস (hierarchy) আলোচনা প্রসঙ্গে মুখার্জী তিনটি প্রধান শ্রেণীর (category) উল্লেখ করেছেন। এই বিন্যাসের শীর্ষে অবস্থানকারী প্রথম শ্রেণীটির মধ্যে রয়েছে চাকুরে, জোতদার ও ধনী কৃষক। মধ্য শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রায়ত, কারিগর, ক্ষুদ্রব্যবসায়ী ও (অ-চাষী) ভূমিমালিক। সর্বনিম্ন শ্রেণীতে রয়েছে রায়ত বর্গাচাষী, কৃষিমজুর, বর্গাচাষী এবং ভিক্ষুক। মুখার্জী এদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী আখ্যা দেন এবং এগুলোকে পেশাজীবী শ্রেণীরূপেও অভিহিত করেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থালি বাজেট ও জীবন যাত্রার সূচকের গড়ের প্রেক্ষিতে পরিবারসমূহের ক্রমোচ্চ বিন্যাসে লক্ষনীয় যে চাকুরে শ্রেণীর পরিবারের বিরাট অংশ উদ্বৃত্ত বাজেটের অধিকারী। জোতদার শ্রেণীর ক্ষেত্রে বৃহত্তম অংশ উদ্বৃত বাজেটের অধিকারী হলেও সুষম বাজেটের অধিকারী পরিবারের সংখ্যাও যথেষ্ট এবং ঘাটতি বাজেটভুক্ত পরিবারের সংখ্যাও নগণ্য নয়। কৃষক শ্রেণীর

ক্ষেত্রে বৃহত্তম সংখ্যক পরিবারের বাজেট হলো সুষম। কিন্তু ঘাটতি বাজেটের অধিকারী পরিবারের সংখ্যাও যথেষ্ট এবং উদ্বৃত্ত বাজেটের অধিকারী পরিবারের সংখ্যা খুবই নগন্য। অতএব মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, প্রথম শ্রেণীর জনগণের জীবন সহজ ও সমৃদ্ধময়। তৃতীয় শ্রেণীর জনগণের জীবন যাত্রা কোনমতে নির্বাহ হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জনগণের অবস্থান এ দু'য়ের মাঝামাঝি (মুখার্জী, ১৯৭১ ঃ ১৫৪)।

নাজমুল করিমের (Nazmul Karim) গ্রন্থটিতে ভারত ও পাকিস্তানের সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে বৃটিশ শাসনের প্রভাবকে উল্লেখ করেছেন।

লেখকের মতে, বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের অংশরূপে বাংলাদেশীয় সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল স্বয়ম্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি। ফলে বহু শতাব্দী যাবত এ সমাজে কোন পরিবর্তন সূচীত হয়নি। পূর্ববর্তী শাসন ব্যবস্থার তুলনায় মুসলিম শাসনামলে অবশ্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয় যার ফলে সামন্তবাদী ভারতীয় সমাজব্যবস্থা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবার পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু ঠিক সেই সময় দুঃসাহসী ইংরেজ বণিকগণ কর্তৃক ভারতবর্ষ বিজিত হবার ফলে সে সম্ভাবনা অংকুরেই বিনষ্ট হয়। বৃটিশরা এদেশে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অর্থনীতি ও ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন করে যা ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর ওপরে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। বস্তুত ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশ ইংরেজ প্রবর্তিত হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই ফলশ্রুতি।

Metcalf Charies, Sir Henry Maine, and Karl Marx কিংবা অপরাপর ধ্রুপদী চিন্তাবিদগণ ভারতীয় গ্রামগুলিকে বিচ্ছিন্ন এবং স্বয়ম্ভররূপে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু সে ধারণা বর্তমানে চ্যালেঞ্জের

সম্মুখীন হয়েছে। জায়দি গ্রামগুলোর জনসাধারণকে সম্পত্তির পরিমাণ, তথ্যাভিজ্ঞতা, শিক্ষা বয়স ও ক্ষমতানুসারে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন ঃ কতকগুলো পরিবার রয়েছে যাদের জমি আছে, আবার কতকগুলো পরিবার রয়েছে যাদের জমি নেই। এ দু'ধরনের পরিবার পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। এ জাতীয় পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এক ধরনের সামাজিক সম্পর্ক এবং এ সম্পর্ক খানিকটা অসংবদ্ধ হলেও খুবই কার্যকর।

১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে দু'টি নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় – ভারত ও পাকিস্তান। ১৯৫০ সনে জমিদারি উচ্ছেদ আইন দ্বারা তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে ভূমিসংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯৫২ সালে বাংলাভাষা আন্দোলন সংগঠিত হয়। তারপর ১৯৫৮ সালে এবং পুনরায় ১৯৬৯ সালে সামরিক আইন জারী করা হয়। ১৯৭১ সালে বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এই সমস্ত মুখ্য ঘটনাবলি বর্তমান বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ জীবনে পরিবর্ধনের সূত্রপাত করে এবং তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক স্তর বিন্যাসটি বহুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

আমরা বর্তমানে বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, বাংলাদেশে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা ও অমালিকানার ভিত্তিতে গ্রামবাসীরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং গ্রামের প্রধান উৎপাদনের উপায় হলো জমি। অতএব জমির মালিকানা এবং অমালিকানার ভিত্তিতে বিভক্ত গ্রামের তিন শ্রেণীর জনগণকে উর্ধ্ব থেকে নিম্ন ক্রমানুসারে সাজালে এ রকম দাঁড়ায় ঃ ভূস্বামী (মালিক), বর্গাচাষী এবং ভূমিহীন কৃষি মজুর (কামলা বা বদলা)।

গ্রামের সামাজিক স্তর বিন্যাসের অপর ভিত্তি হলো উচ্চ বা নিম্ন মর্যাদা। গ্রামের মুসলমান জনসাধারণ মর্যাদার প্রেক্ষিতে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত ঃ খানদান, গেরস্ত ও কামলা। খানদানরা উচ্চ এবং গেরস্তরা নিম্ন মর্যাদার অধিকারী। কামলাদের সামাজিক মর্যাদা সর্বনিম্ন। গ্রামের মুসলমানদের আরো দুটো পেশাগত শ্রেণী আছে, তারা হলো ঃ বদ্যি বা চক্ষুশল্যবিদ এবং জোলা বা তন্তুবায়ীগণ, এদের উভয়েরই সামাজিক মর্যাদা নিচু। গ্রামের সামাজিক স্তরবিন্যাসের তৃতীয় ভিত্তিটি হলো ঃ ক্ষমতা। ক্ষমতার অসম বিন্যাসের প্রেক্ষিতে গ্রামের জনগণ দু'ভাগে বিভক্ত। একদিকে রয়েছে যারা ক্ষমতার অধিকারী এবং অন্যদিকে রয়েছে যারা ক্ষমতার অধিকারী নয়। গুটি কয়েক ব্যক্তির হাতেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত বাদবাকি জনগণের হাতে অতি সামান্যই রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রভাব রয়েছে। গ্রামে ক্ষমতার আভ্যন্তরীন উৎস হলো- জমির মালিকানা ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি বা সদস্য পদাধিকার ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা ইত্যাদি। আর বাহ্যিক উৎসগুলি হলো ঃ রাজনৈতিক দলের সদস্য পদাধিকার স্থানীয় সংসদ সদস্য পদাধিকার উচ্চ পদস্থ অফিসার কিংবা পুলিশের সাথে যোগাযোগ এবং বিষয় সামগ্রীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই হলো গ্রামে ক্ষমতাবান হবার চাবিকাঠি।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, জমির মালিকানা মোটামুটি সকলেই হয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুসলমান নয়তো উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং গ্রামে ক্ষমতা মুষ্টিমেয় খানদান মুসলমানের হাতেই কেন্দ্রীভূত। গ্রামের রাজনীতিতে ভূমিহীন মজুর (যারা নিম্ন মর্যাদার মুসলমান) এবং কয়েকটি পেশাগত শ্রেণী যেমন জেলে, কামার ও ছুতার যারা তফসিলী হিন্দুদের মতামতের মূল্য অতি সামান্য।

বর্গাচাষীদের অবস্থান শ্রেণীভেদের এই ক্রমোচ্চ বিন্যাসের মাঝামাঝি স্থানে। তারা মোটামুটি ছোট গেরস্ত শ্রেণীর মুসলমান কিংবা নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের মত। এদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কিংবা প্রভাব অতীব সামান্য।

বৃটিশ পণ্ডিত ও প্রশাসকগণসহ অনেক লেখকই দক্ষিণ এশীয় মুসলিম সমাজে বিরাজমান বর্ণ প্রথা সমন্ধে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। পরবর্তীতে নৃবিজ্ঞানীগণ তাদের মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষার সময় এ সকল বিষয়ে অবগত হন। Mukherjee-র মত আরো অনেক গবেষক যেমন নিজাম উদ্দিন আহমেদের প্রতিবেদন হতে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত ঢাকা জেলার বিভিন্ন বর্ণ গোষ্ঠী সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯০১ সালে গেইট (১৯০২) ভারতের বাংলা প্রদেশের শুমারীর রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। এতে তিনি বাংলা প্রদেশে বিরাজমান বহু বর্ণ গোষ্ঠীর নাম এবং বিবরণ প্রকাশ করেন। Gate-এর মতে, হিন্দুদের মধ্যে গঠিত গোষ্ঠি পঞ্চায়েতের মত মুসলিম বর্ণগোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও পঞ্চায়েত ছিল। এ ধরনের সকল দলই আজলাফ তথা নিম্নস্তরের লোকদের অন্তর্ভুক্ত। (ইমতিয়াজ আহমদ ১৯৬৭) অধিকাংশ দশ বার্ষিক শুমারিগুলোতে জাতি বা উপজাতি বিভাজনের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ বেশির ভাগই "শেখ" দলের সদস্য হিসেবে তালিকাভূক্ত হন যদিও বিভিন্ন দশকে এবং বিভিন্ন জেলায় অনেকেই "সৈয়দ" বা পাঠান দলের মধ্যেও নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৮০১ সালে পরিচালিত আদমশুমারিতে মুসলমান এবং হিন্দুদের বর্ণপ্রথার তালিকা প্রণয়নে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল তথাপি উক্ত উপাত্তসমূহ পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয়নি। ১৮৯১ সালে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা সমীক্ষার আওতায় এসেছিল তাদের শতকরা ৯৫ জনই পরিচয় এবং পেশার দৃষ্টিকোণ হতে শেখদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১৯০১-১৯৩১ এই সময়ে ২০ থেকে ৩০ বৎসর সময়কাল পর্যন্ত বাংলার মুসলমানগণ অন্ততপক্ষে তাদের মর্যাদার

কারণে আত্মপরিচয়ের সন্ধানে বাংলার ব্যাপৃত ছিল। শ্রী নিভাসঃ (১৯৬৮ সালে তার সর্বশেষ বিবরণ) ও অন্যান্যদের বিবরণ ও ব্যাখ্যা হতে দেখা যায় বিপুল সংখ্যক লোকের এ ধরনের আশরাফ শ্রেণীভূক্ত হবার প্রবণতা যা প্রকৃতপক্ষে মর্যাদা বৃদ্ধি করাকেই বুঝায় সেটি আসলে এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকরণের নামান্তর। বস্তুত মুসলমানদের সংস্কৃতিকরণ প্রক্রিয়া ঐ সকল শুমারীর প্রতিবেদনে প্রতিভাত হয়েছে। বার্লের (১৮৭৫ ঃ ১৯১) মতানুসারে মুসলমানদের এই চারটি (সৈয়দ, পাঠান, মোগল, শেখ) উপজাতিকে খুব নগন্যভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে (বার্টোসি, ১৯৯২, পৃ. ৬৫)।

আদম শুমারীর প্রতিবেদনে মুসলমানদের অনির্দিষ্ট অবস্থানের বিবরণ সত্ত্বেও তিনি স্পষ্টভাবেই বলেন, বাংলার অধিকাংশ মুসলমানগণই শেখ পদবী গ্রহণ করেছিল। ১৮৯১ সালের দিকে O'Donnell (পৃষ্ঠা ২৬৮) তাঁর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ তাদের পদবী এবং পেশা নির্বাচনের প্রশ্নে দলীয় ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছিল। উচ্চ বংশের মর্যাদায় আরোহণের ক্ষেত্রে মুসলমানগণের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের বিষয়টি এ ক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ১৯০১ সালে Gate-এর (১৯০২ গআ: ৪৪২) বর্ণনায় দেখা যায় বাংলার মুসলমানগণ শেখ উপাধিকেই অধিকতর পছন্দ করতেন - এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন সুনির্দিষ্ট আকারবিহীন এই শেখদের দলে কেবল বিরাটসংখ্যক হিন্দুই নয় একই সঙ্গে বিপুলসংখ্যক জোলা বা তাঁত পেশাজীবি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, যাতে মুসলমানদের আপত্তি ছিল। বাঙ্গালী মুসলমানগণ সর্বদাই নিজেদের শেখ বলে দাবি করতে পছন্দ করতেন। তখনকার সময়ে হালিয়া কৈবর্তগণ তাদের মহীয়ান বলে দাবি করে। পড়সগণ তাদের পূর্ণ ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে এবং নিম্ন শ্রেণীর চন্ডালগণ নিজেদেরকে নমশূদ্র বলে অভিহিত করে তাহলে সেক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমান চাষীদের "শেখ" হবার দাবিকে মোটেই

অযৌক্তিক বলা যায় না। এটা সর্বজনবিদিত যে, মুসলমানদের আগমনের পর বাংলার ইতিহাস হতে যতদূর জানা যায় পল্লী এলাকাগুলোতে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য এবং সামাজিক সমন্বয় ছিল।

বাংলার মুসলমানগণ দীর্ঘদিন যাবত শেখ পদবীর জন্য যে দাবি জানিয়ে আসছিল তা শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে শেখ হবার জন্যই নয় বরং কার্যকর শেখ হবার জন্যই। তাদের এমন আচরণের কারণ যাই হোক না কেন, এটা সত্য যে, এই ঘটনা গ্রামীণ পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে ধারণা লাভের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। যা কখনই সম্ভব নয় তৎসত্ত্বেও শেখ পদবীর জন্য সবার সার্বজনীন দাবি। এই বিষয়টিকে দরকষাকষির জটিল পর্যায়ে উপনীত করেছে এবং একইসাথে ফলপ্রসু আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে (বার্টোসি ১৯৯২, পৃ. ৬৯)।

Nicholas কর্তৃক পূর্বেই যে সমস্ত অনুমানসমূহ প্রণীত হয়েছে সেগুলোর প্রেক্ষিতে বলা যায় যে গ্রামীণ বাংলার সামাজিক সংগঠনের ঐতিহাসিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি সীমান্তবর্তী সমাজের (Frontier Society) বিবর্তনসমূহে সর্বাধিক জ্ঞান লাভ করা যায়। ১৯৬৯ তার সম্প্রতি লিখিত এক প্রবন্ধে সীমান্তবর্তী অনুসিদ্ধান্তসমূহ সংক্ষেপিত করেন এবং এতে তিনি এই সক্রিয় ব-দ্বীপের অধিবাসীদের উল্লেখযোগ্য বর্ণগত সাদৃশ্যের কারণসমূহের বিবরণ দেন (বার্টোসি, ১৯৯২: ৬৯)।

এই ব-দ্বীপের অধিকাংশ সীমান্ত সদৃশ অংশগুলোর বর্ণগত গঠনবিন্যাস খুবই সরল। সবচেয়ে বেশি উর্বর মৃত্তিকাবিশিষ্ট এই এলাকাটিতে প্রতি বছর সবচেয়ে বেশি বন্যা হয় এবং দেখা যায় একটি মাত্র

বর্ণগোষ্ঠীর সদস্যরা সর্বদা এই সমগ্র অঞ্চলের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। শেখ পদবীতে প্রায়শ:ই পরিচিত মুসলমান চাষী বর্ণগোষ্ঠীর সদস্যরা পূর্ব বাংলার অধিকাংশ গ্রামীণ জেলাগুলোতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ব-দ্বীপের অগ্রবর্তী হিন্দু সমাজের পূর্ববর্তীগণ ছিল প্রাথমিকভাবে মহীশান পড এবং নম: শূদ্র শেখ, মহীশাণ পড এবং নম:শূদ্রগণই তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ হিসেবে বিরাজিত ছিল। গৃহ নির্মাণ, নৌকা চালনা, মাছ ধরা এবং গভীর পানিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ কৌশল তাদেরকে এই ব-দ্বীপীয় এলাকায় জীবনধারার সাথে সম্পৃক্ত করেছিল (পিটার জে. বার্টোসি, অস্পষ্ট গ্রাম, ১৯৯২: ৬৯)।

এ সকল দলগুলোর উৎপত্তি ছিল নন-এরিয়ান হিসেবে। তথাপি তারা ছিল বাংলার আদি অধিবাসী, তারা যে বিভিন্ন বিশেষ বর্ণগোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল এমন কোন দলিলপত্র নেই। সাদৃশ্যবিহীন "বিদেশী" অভিজাত সমাজের অগ্রবর্তী সদস্য হিসেবে এরা ঐ অপেক্ষাকৃত সাধারণ এবং স্তরবিহীন ব-দ্বীপীয় সমাজে অন্যস্থান হতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এরা তখনকার সাধারণ গ্রামবাসীদের তুলনায় স্বতন্ত্র ছিল এবং ধর্ম সমাজ সম্পর্কে এদের জ্ঞান ছিল (নিকোলাস, ১৯৬৯ ঃ ৩৬-৩৭)।

এভাবে পশ্চিম বাংলার নদী বিধৌত ব-দ্বীপীয় জেলাসমূহে মোটামুটি ৭/৮ ধরণের বর্ণগোষ্ঠীর মানুষদের দেখা যেত। যেমন মহিশা গোষ্ঠীর কৃষকরা ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী বর্ণগোষ্ঠী এবং তারাই ছিল সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ। এই একই ধরনের স্থানান্তর এবং বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া পূর্ব-বাংলার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোর (বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) আদি অধিবাসীগণ সম্ভবত: নম: শূদ্র চাষীদেরই বংশধর (বার্টোসি, ১৯৯২: ৭০)।

অধ্যায় ৩

ধারণাগত আলোচনা

৩. ক. দ্বন্দ্বের উৎপত্তি

ঝগড়া, বিরোধ এবং দ্বন্দ্ব এ শব্দগুলো সম্পূরক শব্দ হলেও এর মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান। ঝগড়া হলো একটি সংক্ষিপ্ত সাময়িক (Short time) প্রক্রিয়া। অন্যদিকে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ হল একটা বিস্তৃত সাময়িক (long time) প্রক্রিয়া।

বিশ্বে জনশ্রুত আছে যে, দ্বন্দ্ব শব্দটি বিভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয়। যেমন Fight (যুদ্ধ) Struggle (সংগ্রাম), Collision (দ্বন্দ্ব) বা Clashing (সংঘাত)। এগুলো আসে মূলত disagreement (অসম্মতি), Struggle Clash অথবা incompatibility (অসমতা) থেকে। এই মৌলিক অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে সমাজবিজ্ঞানীরা দ্বন্দ্বকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেও বিরোধের সৃষ্টি হয়। এখানে এ দু'এর মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঈর্ষা, অসূয়া জাগায়, হার-জিতের পরে বিজিত সংঘর্ষের সহিষ্ণুতার বিবেকী বিবেচনা শক্তির স্বল্পতার দরুণ মারামারি হানাহানি প্রবণ হয়। ফলে তা সংঘর্ষ, সংঘাত-লড়াই অনিবার্য করে তোলে। প্রতিদ্বন্দ্বী দেহে-প্রাণে, মনে-মগজে, মননে-মনীষায় দীন ও ক্ষীণ থাকে। অনুশীলনের অভাবে জ্ঞান-প্রজ্ঞা, যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক বিবেচনার ক্ষেত্রে হীন, অদক্ষ, অনিপুন আত্মপ্রত্যয়হীন থাকে ততো বেশি হয় ক্ষোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা-অসূয়া ও হীনতার শিকার। ফলে অসংযত, অসহিষ্ণু, অবিবেচক, অস্থির, উন্মত্তচিত্ত চালিত হয়ে সে বিজয়ীর উপর হামলা চালানোর উত্তেজনা প্ররোচনাকে নায্য বলে মনে করে (শরীফ, ১৯৯৮: ৭৬)।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Georges Sorel তাঁর অযুক্তিবাদী রাষ্ট্রদর্শনে হিংস্রতাকে (Violence) সব কিছুর উপরে স্থান দেন। তিনি বলেন যে, সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ শান্তি ও নম্রতার মধ্য দিয়ে সাধিত হয়না, সাধিত হয় হিংস্রতা ও বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে। তিনি অবশ্য দৈহিক বল (force) এবং হিংস্রতার (Violence) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে বলেন যে, Marx, Lenin, Trotsky প্রমুখ চিন্তাবিদ বিপ্লব শব্দটি ব্যবহার করে যা বোঝাতে চেয়েছেন, হিংস্রতা শব্দের দ্বারা প্রায় সেই জিনিসকেই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, দৈহিক বল ও হিংস্রতা এ দুটি শব্দই কোন কোন সময় শাসকের জবরদস্তিকে এবং কোন কোন সময় সাধারণ বিপ্লবী তৎপরতাকে বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, দুই ক্ষেত্রের ফলাফল কোন সময় এক রকম হয়না। আমি মনে করি যে, দ্ব্যর্থকতা এড়ানোর জন্য একেক ক্ষেত্রে একেক রকম পদ ব্যবহার করা উচিৎ এবং বিপ্লবী তৎপরতাকে বোঝানোর জন্য হিংস্রতা (violence) শব্দটি ব্যবহৃত হওয়াই অধিক সমীচীন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, শক্তি প্রয়োগ করে সংখ্যালঘু শ্রেণী তার কর্তৃত্ব বলবৎ করে সেটি হচ্ছে দৈহিক শক্তি বা ফোর্স এবং যে শক্তি প্রয়োগ করে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘুর কর্তৃত্বকে প্রতিরোধ করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সেটি হচ্ছে হিংস্রতা বা Violence। আধুনিক যুগের শুরু থেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে এসেছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে প্রলিতারিয়েত শ্রেণী হিংস্রতা প্রয়োগ করে এই দৈহিক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।[৯]

Sorel আরো বলেন যে, গণতন্ত্রে বুর্জুয়া রাজনীতিকগণ তাদের বুদ্ধিজীবী মোসায়েবদের সহযোগিতায় দৈহিক বল প্রয়োগ করে শ্রমিকদেরকে দাবিয়ে রাখতে চায়। প্রকৃতিগতভাবেই

দৈহিক বল দুর্নীতিগ্রস্ত ও অবৈধ (Corrupt and illegitimate) পক্ষান্তরে প্রলিতারিয়েত শ্রেণী যখন বুর্জুয়া রাজনীতিকদেরকে এবং তাদের ক্রীড়নক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য দৈহিক বল বা Violence প্রয়োগ করে তখন সে বলকে তিনি বৈধ ও মাহাত্মমণ্ডিত বলে আখ্যায়িত করেন এবং বলেন যে, এই বল শ্রমিকদেরকে দুনির্তীগ্রস্ত করে না বরং তাদেরকে মহত্ত্ব ও মর্যাদার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে হাজির করে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, শ্রমিকদেরকে যদি উন্নতমানের নৈতিক প্রত্যয়ে (Lofty moral convictions) উদ্বুদ্ধ করতে হয় তাহলে স্থায়ী ভিত্তিতে যুদ্ধংদেহী পরিবেশ টিকিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু হিংস্রতা বর্জন করে এ ধরনের কোন পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই কারণেই হিংস্রতাকে তিনি নৈতিক প্রত্যয় অর্জনের প্রকৃষ্টতম উপায় বলে গন্য করেন।

Sorel বলেন যে, ইংলন্ডনীয় শ্রমিক ইউনিয়নগুলির ন্যায় কোন শ্রমিক ইউনিয়ন যদি মধ্যবিত্ত বুর্জুয়া শ্রেণীর সাথে আপোসমূলক ও শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার নীতিতে মিলিত হয় তাহলে যে নৈতিকতা গড়ে ওঠে তা হচ্ছে নীচতা ও হীনতার নৈতিকতা (morality of meanness)। এই কারণে তিনি শ্রমিকদেরকে যুক্তিবাদী ও শান্তিপূর্ণ মনোভাব অবলম্বন না করে অযুক্তিবাদী ও যুদ্ধংদেহী মনোভাব অবলম্বন করার জন্য উৎসাহিত করেন এবং ধোকাবাজ রাজনীতিকদের সঙ্গ এড়িয়ে চলার উপদেশ দেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, এসব রাজনীতিকদের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে মিলিত হয়ে শ্রমিকরা কেবল নীচতা ও হীন মন্যতার নৈতিকতাই গঠন করতে পারে, মহত্ত্ব ও বীরত্বের নৈতিকতা নয়।

সৃষ্টির লগ্ন থেকেই মানুষের অস্তিত্বে বিরোধের ধারনা বিদ্যমান। "Conflict is ingrained in existence" (Adhikari, 1981, VII). এ প্রসঙ্গে Hobbes-এর কথাও বলা যায়। English philosopher Thomas Hobbes (1588-1679) did not think much of goodness of human nature. He was of the view that prior to the advent of society, men live in a state of conflict (Jayaram Saberwal,1996, p. 2).

ইমানুয়েল কান্ট-এর কথা বলা যায়। তিনি মানুষের ভাল দিকগুলো দেখেছিলেন। German idealist and philosopher Immanuel Kant (1724-1804) thought of goodness or selfishness of human nature. ইংরেজী ডিকশোনারী Conflict এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, æa struggle or clash between opposing forces, battle. It is a normal product of diversity in a beliefs and values differences in attitudes and perceptions and competing socio-economic and political interests among individuals, social classes, ethnic groups and states" [Contemporary Analysis, P. 50].

Mohammad Rabie argues that because conflict is about values, beliefs, interests and perceptions, it occurs at every level of human and state interaction. It is important to keep in mind that not all conflicts are bad. In business, competition that is a form of conflict may stimulate one to work harder and to produce more or to carry out a project more efficiently or more imaginatively.

In personal relationships, conflict provided it is not destructive, creates tension that stimulates creativity to find new avenues to deal with problem.

রবার্ট লি এর মতে, দ্বন্দ্ববিহীন সমাজ মৃত সমাজেরই নামান্তর।

According to Robert Lee said that æThe society without conflict is a dead Society: Conflicts analyses may be traced of the ancient world of the raclitus (C. 544-484 BC) in Greece, Kautilya (C. 300 BC) in Rome.

লিউজ কোজার বরাবরই উল্লেখ করেছেন যে, দ্বন্দ্ব সমাজকে উন্নতির দিকে টেনে নিয়ে যায়।

Lewis Coser (1956 : 8) Suggests that social conflict may be taken to mean a struggle over values and claims to scarce status power and resources in which the aims of the opponents are to neutralize injure or eliminate their rivals: Defined thus, Conflict is a comprehensive category, encompassing a variety of phenomena from brawls in the bazzar to wars between nations. (The social science Encyclopedia, 1996 : 221)

সমাজবিজ্ঞানের ভাষায়, 'conflict does not mean random disorder, ærather it refers to meaningful action in pursuit of goals (Rex 1981: 104, 119)

It is a particular kind of sociation (Simmel 1955, 13) or social relationship (Weber 1964, 132)

It entails the formation of collectivities and has implications for interconnected institutions.

Marx (1963, 67) identified the opposition between" the forces of production," and the ærelations of Productions" as the prime contradiction of any socio-economic formation, which can only be resolved by the destruction of that formation. On the other hand, the opposition arising from a supervision- worker confrontation can be resolved without destroying the relationship between them.

Rapaport (1960: 8) has proposed a three fold classification of cnflicts: fights, game and debates.

Dr. Dalem ch. Barman Zuvi তাঁর Emerging leadership pattern in Rural Bangladesh শীর্ষক অভিসন্দর্ভে উল্লেখ করেছেন যে, Conflicts are ingrained in existence and therefore no study of human society can afford to exclude their study," (1983: 867).

তাঁর গবেষণায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, æIt is a struggle over values and claims to status, power and scrace resources" and where æthe consequence of the struggle may result in the neutralization, injury or elimination of the rival groups," (1983, 467).

প্রাচীন সমাজ তথা অগ্রসরমান সমাজ ও সভ্যতার পরিমণ্ডলে মানব জীবনের বহুমুখী কামনা-বাসনা পরিতৃপ্তির পথে প্রতিনিয়ত বিবিধ প্রতিবন্ধকতা ছিল এবং আছে যার কারণেই পূর্বতন সমাজ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আমরা সমাজে নানাবিধ দ্বন্দ্ব লক্ষ করে থাকি। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে চাহিদা মেটাতে গিয়ে বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতার শিকার হচ্ছে। চাওয়ার সাথে পাওয়ার মিল থাকছে না। না পাওয়াতে সে নিরাশ হচ্ছে, এই নৈরাজ্য থেকে মানুষ হতাশ হচ্ছে। হতাশার ফলে মানুষের মনে বিভিন্ন রকমের মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। হতাশাবোধক এই মানসিক প্রতিক্রিয়া থেকেই মানুষের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে। (সরকার **১৯৯১**, নং ঃ ৩৩৫) সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই প্রতিনিয়ত তাকে বিভিন্ন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হচ্ছে।

এক বা একাধিক বিষয়ের প্রতি পরস্পর বিরোধী ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া থেকে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পারে। অথবা "যখনই আমাদের মধ্যে সমান শক্তিশালী পরস্পর বিপরীত দুটি প্রেষণা একই সময়ে উপস্থিত হয় তখনই সৃস্টি হয় দ্বন্দ্ব" (সরকার, **১৯৯১** ঃ ৩৩৭)।

"যেমন কোন একজন মেধাবী ছাত্র এম. এ পাশ করার পরে উচ্চতর ডিগ্রীও নিতে চায় আবার চাকুরীও করতে চায়। যার ফলে সময়ের অভাবে দুটো কাজ একসঙ্গে তার পক্ষে করা সম্ভব নয়, ফলে সে মানসিকভাবে হতাশ হয়ে পড়ে। হতাশার ফলে তার ভিতরে মানসিক ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সেখান থেকেই তার ভিতরে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়" (প্রাগুপ্ত)।

মানুষ সামাজিক জীব বলেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যকলাপ মেটাতে গিয়ে তাকে তার পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণী বলতে গেলে উচুঁ শ্রেণী থেকে নিচু শ্রেণী সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গেই তাকে ওঠা-বসা করতে হয় এবং বিভিন্ন কার্যকলাপ সমাধান করতে হয়। এই বিভিন্ন কার্যকলাপ সমাধান করতে তাকে বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়। যেমন দুটি পাড়া, (দক্ষিণ পাড়া এবং উত্তর পাড়া) অধ্যুষিত একটি গ্রামে দূর্গাপুজার উৎসবে আমন্ত্রিত ডেপুটি কমিশনার এসে মেয়েদের শিক্ষার মান আরো উন্নত করার লক্ষ্যে একটি গার্লস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দেন। দক্ষিণ পাড়ার লোকজন কখনই চায়না যে উত্তর পাড়ায় কোন রকমে কোন স্কুল প্রতিষ্ঠা পাক। আর উত্তর পাড়ার লোকজনদেরও দক্ষিণ পাড়ার লোকজনদের প্রতি বিরূপ মনোভাব। এই বিরূপ মনোভাবের কারণেই দুই পাড়ার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

সমাজে সাধারণত দুটি শ্রেণী পরিলক্ষিত হয় যথা উচুঁ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণী। এ ছাড়া আরো বহুবিধ শ্রেণী রয়েছে। এই উচুঁ শ্রেণীর লোকজন সবসময় নিচু শ্রেণীর লোকজনদেরকে নানাভাবে শোষণ করে থাকে। উচুঁ শ্রেণীর লোকজনের আকাঙ্খা থাকে অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান-গরিমায় তারা সব-সময়ই উন্নত থেকে উন্নতর হবে। ধন-সম্পদে বড় হতে গিয়ে তারা সব-সময়ই গরীব কৃষক শ্রেণীর জমি শোষণ, দখলদার নিলাম, বর্গাভাগ বেশি, শ্রমমূল্য কম এইসব উপায় বেছে নেয়। ফলে দেখা দেয়, উচুঁ-নিচু শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব।

প্রমোদ বন্ধু সেনগুপ্ত তার মনবিদ্যা বইটিতে মানসিক সংঘাতের বিভিন্নরূপ তুলে ধরছেন। তার ভাষায় "ব্যক্তির জীবনে মানসিক সংঘাত বা দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। এমনকি

মনুষ্যত্যের প্রাণীর মধ্যে আমরা তার সহজাত প্রবৃত্তি যেমন ঃ ভীতি বা ক্ষুধার মধ্যে সংঘাত লক্ষ করি। মানুষের জীবনে এই মানসিক সংঘাত নানাস্তরে দেখা যায়। তার সহজাত প্রবৃত্তি যেমন ঃ ভীতি, আত্মমর্যাদাবোধ যৌন ইচ্ছা এবং নৈতিক বোধের মধ্যে সংঘাত পরিলক্ষিত হতে পারে। (প্রাগুক্ত ১৯৯২ ঃ ৫৪৮) মানুষের সেন্টিমেন্ট বা রসের মধ্যেও দ্বন্দ্ব দেখা যায়। যেমন পরিবারের প্রতি অনুরাগ বা বন্ধুর প্রতি অনুরাগের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত পরিলক্ষিত হয়।

৩. খ. বিরোধ বা দ্বন্দ্বের অবস্থান

হতাশাজনিত দ্বন্দ্ব ঃ

জীবনে সব চাওয়া কখনই পূর্ণ হয় না। চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে অনেক বাঁধা আসে। "প্রেষিত আচরণ বাঁধাপ্রাপ্ত হলে, অর্থাৎ প্রাণী তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারলে সৃষ্ট হয় হতাশা। হতাশার ফলে প্রাণীর অভ্যন্তরীন জগতে যে বেদনাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় চাপ। চাপের আর একটি প্রধান উৎস হল প্রেষণার দ্বন্দ্ব" (সরকার, ১৯৯১ ঃ ৩৩৫)।

মনোবিজ্ঞানীগণ মানুষের মনোজাগতিক আচরণকে বিশ্লেষণ করে এই মর্মে উপনীত হয়েছেন যে হতাশা ও দ্বন্দ্ব মানব জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা। হতাশা ও দ্বন্দ্ব নানাভাবে প্রাণীর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার এটাও বলেছেন যে, হতাশা ও দ্বন্দ্বের স্বার্থক অথবা ত্রুটিপূর্ণ

পরিণতির উপরেই নির্ভর করে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য অথবা মানসিক 'অসুখ'। সুতরাং আমাদের অস্বাভাবিক আচরণের বা মানসিক রোগের কারণ বুঝতে হলে হতাশা ও দ্বন্দ্বকে বুঝতে হবে।

হতাশার উৎস অনেক। মানুষ কখনও বন্ধুর সাথে দেখা না হওয়াতে মানসিক চাপ অনুভব করতে পারে। কখনও বিবাহের জন্য সঠিক পাত্র না পাওয়াতে মানসিক চাপ ভোগ করতে পারে। আবার কখনও বা পড়াশুনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান না পাওয়াতে মানসিক চাপ ভোগ করতে পারে।

সাধারণভাবে "দু'ধরনের উৎস হতে হতাশার সৃষ্টি হতে পারে" (খালেক, ১৯৯৬ : ১১৯)।

ক) আর্থসামাজিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত হতাশা।

খ) ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাজনিত হতাশা।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত হতাশা ঃ জন্মের পর থেকেই শুরু হয় সামাজিক কারণ থেকে সৃষ্ট হতাশা। যখনই মানুষ ধীরে ধীরে সমাজের সাথে মিশতে থাকে তখনই তাদের কিছু ব্যক্তি স্বাধীনতা অস্বীকার করতে শেখানো হয়। যেমন, পড়াশুনা বাদ দিয়ে কখনোই খেলাধুলা করা যাবে না বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়া যাবে না। ছেলেদেরকে শেখানো হয়, স্কুলে গিয়ে মেয়ে বান্ধবীদের সাথে অযথা রসিকতা করা যাবে না। এমনিভাবে প্রতিটি প্রেষণা মেটানোর জন্য সমাজে কতগুলো রীতি বা সামাজিক নিয়ম প্রচলিত আছে। অনেক সময় ঐসব রীতিনীতি মানুষের প্রেষণা চরিতার্থ করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, যৌন প্রেষণা চরিতার্থ করার জন্য একজনকে বিয়ে করতে হবে। আবার বিয়ে করার জন্য ব্যক্তির উপযুক্ত আর্থিক সঙ্গতি ও সামাজিক মর্যাদার প্রয়োজন।

প্রকৃতগত বাঁধা-বিপত্তির কারণেও অনেকে হতাশ হতে পারে। যেমন, বন্যা, খরা, ঝড়-বৃষ্টি, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প, দুর্ঘটনা, জখম, প্রিয়জনের মৃত্যু, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থনৈতিক মন্দা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, সমাজ ও সংস্কৃতির দ্রুত পরিবর্তনশীলতা, আর্থসামাজিক অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ইত্যাদি।

মোট কথায় বলতে গেলে আমাদের মত অনুন্নত, দরিদ্র, অশিক্ষিত সমাজে হতাশার অন্ত নেই। গোটা আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পুরো সমাজ জীবনেই হতাশার সৃষ্টি করেছে।

ইতিহাসগত দিক থেকেও মানুষ প্রচুর পরিমাণে হতাশাগ্রস্থ হতে পারে। যেমন, "বৃটিশ শাসন শোষণের বিরুদ্ধে এদেশবাসী কঠোর সংগ্রাম করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিল। ভেবেছিল এই অঞ্চলের কৃষক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত পেশাদার শ্রেণী তাদের নিজ নিজ পেশায় নিয়োজিত থেকে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা পূর্ব বাংলার সাধারণ জনগণ পুনরায় অত্যাচারিত হতে লাগল, শুরু হল শোষণ ও বঞ্চণার আরেক ইতিহাস। এদেশবাসী হতাশ হল তাদের স্বপ্ন-সাধ ভেঙ্গে যেতে দেখে। প্রতিবাদ উঠলো, আন্দোলন হল ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬৬, এবং ১৯৬৯ সনে। অবশেষে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসল কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। পশ্চিমা শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করে বাঙ্গালী আবার স্বপ্ন দেখল সুখী জীবনের আর সমৃদ্ধ এক দেশের। কিন্তু বাঙ্গালী এতই দুর্ভাগা যে, দেশ স্বাধীন হতে না হতেই স্বার্থবাদী রাজনৈতিক দল, নব্য ধনীক শ্রেণী আর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দু:শাসন ও ষড়যন্ত্রের ফলে দেশ হল দেউলিয়া, রাজনৈতিক দলগুলো হল

লক্ষ্যহীন, অর্থনীতি হল বিপর্যস্ত এবং সমাজ হল দুর্নীতিগ্রস্থ। সমগ্র জনগণ পুনরায় হতাশায় নিমজ্জিত হল। চরম ও গভীর সেই হতাশা, যা শুধু হতাশারই জন্ম দেয়" (খালেক, ১৯৯৬ ঃ ১২১)।

জাতীয় জীবনে বিরাজিত হতাশার প্রতিফলন আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক আচার-আচরণ দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হচ্ছে। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা না করে যে যার মত আখের গুছিয়ে নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতির ফলে গা ভাসিয়ে দিয়ে যে যার মত দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে।

শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড। যার উপরে নির্ভর করে গোটা জাতির ভবিষ্যত। অথচ এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি স্তরেও দুর্নীতি, সন্ত্রাস, বাণিজ্যিক মনোভাব এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অস্ত্রবাজির খেলা চলছে। মান্ধাতার আমলের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও চালু রয়েছে যা বর্তমানকালের ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিকতার সঙ্গে তেমন কোন সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং যা বাস্তবতার সঙ্গে তেমন কোন মিল নেই। এতে ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা শেষ করেও নিজস্ব সৃষ্টি বলতে কিছুই থাকছে না। দেশ ও সমাজের পূনর্গঠনে তেমন কোন ভূমিকাই রাখতে পারে না।

ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাজনিত হতাশা ঃ আমাদের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাজনিত হতাশা প্রচুর। যার অধিকাংশই তৈরি আর্থসামাজিক বিভেদ এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা থেকে। যেমন একটি লোক কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করতে চায়। কিন্তু শারিরীক অসুস্থতার কারণে কঠোর পরিশ্রম করতে পারে না। তাই সে হতাশ হয়ে পড়ে। একজন অধিক রাত জেগে পড়াশুনা করতে চায়। কিন্তু ব্রেইনে সমস্যা থাকাতে রাত জাগতে তার কষ্ট হয়। ছেলেটি হতাশ হয়ে পড়ে। আমাদের এই অশিক্ষিত

সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত হতাশা সবচেয়ে বেশি। এখনও গ্রামের বাবা-মা মেয়ে সন্তানের চেয়ে ছেলে সন্তানের পড়াশুনা থেকে শুরু করে তার ভবিষ্যত গড়ার প্রচেষ্টায় বেশি রত থাকেন। একটি মেয়ে মেধাবী এবং পড়াশুনার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাকে জোর করে বিয়ে দেয়া হয় এবং পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে মেয়েটি খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

মনোস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে The Social Science Encyclopedia Conflict সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, æConflict may occur on many different levels. On the overt behavioural level, a tribes man may be motivated both to approach and to avoid the taboo object. On the verbal level, a person may want to speak the truth but fear to offend. On the symbolic level, ideas may clash and produce cognitive dissonance. On the emotional level, the visceral responses involved in fear and digestion are incompatible. Motives are important in conflict and for this reason the term motivational conflict is often used" (1996 : 220).

শিল্প জগতের দ্বন্দ্ব ঃ

শিল্প জগতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। কল-কারখানা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে প্রায়ই ধর্মঘট, লক-আউট ইত্যাদি লেগেই থাকে। আজ চট শিল্পে ধর্মঘট, কাল মুদ্রণ শিল্পে ধর্মঘট, পরশু ইলেকট্রন সিটি কর্মচারীদের ধর্মঘট তার ঘেরাও আন্দোলন ইত্যাদি। যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশগুলোতেও শ্রমিকরা বিভিন্ন সময়ে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনার্থিক মূল্যবোধের জন্যও সংগ্রাম করে থাকে। "১৯৫৫ সালে ওয়েস্টিং হাউজ কোম্পানির ধর্মঘট দু'সপ্তাহ যাবৎ চলে" (হবীবুল্লাহ, ১৯৭৭ ঃ ২৯০)।

আমেরিকান ম্যানেজমেন্ট সমিতির সাবেক প্রেসিডেন্ট লরেন্স এপ্পে বলেন, "ধর্মঘট কোম্পানির বাইরে নয়, কোম্পানির ভিতরে। এটি এক ধরনের গৃহ যুদ্ধ" (প্রাগুক্ত)। প্রতিষ্ঠানে কার্যরত একদল লোক অপর দলের নিকট কোম্পানির মুনাফা বণ্টন বিষয়ে দাবি জানাচ্ছে। শুধু যে বেতন বৃদ্ধির জন্যই কোম্পানির শ্রমিকরা ধর্মঘট করছে তা নয়, বেতন সমেত ছুটি এবং পেনসন ব্যবস্থাও চায়। আমাদের দেশে অবশ্য বেতনের দাবি অকৃত্রিম দাবি। শ্রমিকরা যে বেতন পায় তা তাদের ভরণ-পোষণের জন্য অপ্রতুল। "সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান নিম্ন মজুরী বোর্ড হিসেব করে দেখে ১২৮ টাকা না হলে একটি শ্রমিক পরিবারের চলে না অথচ সে সময় শ্রমিকরা ১০০ টাকাও মাসে পাচ্ছিল না" (প্রাগুক্ত)। "তদানিন্তন সামরিক সরকার সর্বনিম্ন মজুরী ১২৫ টাকা বেঁধে দিয়েছিলেন। বর্তমানেও একই ব্যবস্থা চালু রয়েছে" (প্রাগুক্ত)। কৃষক শ্রমিক তাদের ন্যায্য দাবি পাওয়ার জন্য এখনও আন্দোলন করে যাচ্ছে। প্রায়ই শোনা যায় সরকারি মিল কারখানা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত মিল কারখানাগুলোর শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য দাবি না পাওয়ার আন্দোলন করছে, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে প্রায়ই অসন্তোষ লেগে আছে। ফলে মিল কারখানাগুলোতে একধরনের দ্বন্দ্ব লেগে আছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিরোধ ঃ

জাতীয় জীবনে যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আঞ্চলিক, জাতি ও বর্ণগত বিষয়কে কেন্দ্র করে বিরোধের উন্মেষ ঘটে, তেমনি আন্তর্জাতিক সমাজেও মানুষ বহুবার আন্তরাষ্ট্রীয় বিরোধ ও সংঘর্ষের শিকারে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন কোনো অধ্যায়ের সন্ধান পাওয়া যায় না যেখানে বিরোধ সম্পূর্ণ অপরিচিত, অনুপস্থিত। বিরোধহীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কল্পনার অতীত।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন সংঘর্ষ বা বিরোধজনিত পরিস্থিতিতে লিপ্ত হয়। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে প্রচণ্ড মনকষাকষি পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রচার অভিমান, সামরিক প্রস্তুতি, ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া ভূ-খণ্ডগত অধিকার সম্প্রসারণ, মতাদর্শগত পার্থক্য, ধর্ম, জাতি-বিদ্বেষ, সীমানা বিরোধ, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, অন্যরাষ্ট্রের উপর বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, জাতীয় আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রয়াসকে আন্তর্জাতিক বিরোধ ও সংঘর্ষের কারণরূপে উল্লেখ করেছেন। সর্বোপরি জাতীয় স্বার্থ রক্ষার অদম্য প্রয়াস হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিরোধের মূল উৎস।

জে. আর. বেরিজ (J. R. Berridge) æInternational Politics: State, Power and Conflict since 1945" নামক গ্রন্থে চার ধরনের বিরোধ বা সংঘর্ষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এইগুলি হলো, অর্থনৈতিক বিরোধ, মতাদর্শগত বিরোধ, জাতি বা বর্ণগত বিরোধ, নিরাপত্তাগত বিরোধ (ঘোষ, ১৯৯৫ ঃ ২২১)।

ভূখণ্ডগত প্রাধান্য এবং আগ্রাসী মনোভাব আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিরোধ ও সংঘর্ষের অন্যতম কারণ। এই সংঘর্ষ কখনও আঞ্চলিক আবার কখনও বা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "জার্মান ও ইতালির ভূখণ্ডগত প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াস প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য অনেক পরিমানে দায়ী ছিল" (প্রাগুক্ত)। আরব রাষ্ট্রসমূহের ভূখণ্ডের উপর ইজরাইলের প্রাধান্য বিস্তারের পরিকল্পনার ফলেই আরব ইজরাইল সংঘর্ষ দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল।

মতাদর্শগত কারণ, ধর্মীয় কারণ, জাতিগত বিদ্বেষ, সীমান্ত বিরোধ, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, আর্থিক কারণ প্রভৃতি কারণেই আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। "১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশসমূহ মতাদর্শগত কারণেই সদ্যোজাত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহযোগে আক্রমনাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।" (প্রাগুক্ত) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বিরোধের কারণে গড়ে ওঠা যে স্নায়ু সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করেছিল তার মূলেও ছিল মতাদর্শগত বিরোধ। ইউরোপের দেশসমূহকে সাম্যবাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী কর্মসূচীর ভিত্তিতে সাম্যবাদের প্রসার রোধে উদ্যোগী হয়েছিল। কিউবা এবং নিকারাগুয়া সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমনাত্মক ভূমিকা নিয়েছিল এর কারণ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি কোনো রাষ্ট্র যদি সাম্যবাদনীতি গ্রহণ করে তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সাম্যবাদনীতি প্রসারিত হতে পারে। ধর্মের বিরোধকে কেন্দ্র করে ব্যাপকভাবে ইরাক-ইরান (সিয়া, সুন্নি) যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। জাতিগত বিদ্বেষ এবং বিরোধের কারণে গ্রীক এবং তুর্কীদের বিরোধ, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের বিরোধ এমনকি গ্রেট বৃটেনেও জাতিগত সমস্যাকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে চীন, ভারত, চীন-সোভিয়েত, পাক-ভারত, বাংলাদেশ এবং আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে নানারকম দ্বন্দ্ব সংঘাত সংঘটিত হয়েছে।

জাতীয়মুক্তি আন্দোলন আন্তর্জাতিক বিরোধের অন্যতম কারণ। উপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কোনো দেশের উপর তা নিয়ন্ত্রণ এবং শাসন হস্তান্তরে অস্বীকৃত হলে নির্যাতিত জাতি মুক্তি

আন্দোলনের মাধ্যমে উপনিবেশিক প্রাধান্য অবসানের জন্য উদ্যোগী হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কঙ্গো, ঘানা, উগাণ্ডা, কেনিয়া, লাওস, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মুক্তি আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়।

কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। আবার নিজের পছন্দ অনুযায়ী অন্যরাষ্ট্রের সরকার অব্যাহত রাখা বা পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করেও বিরোধমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রেনাডায় হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই সেখানকার বামপন্থী সরকারকে অপসারণ করেছে। লাওস, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ইরাক, ইরান-এ মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রধান কারণ ছিল নিজের সমর্থন পুষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এই কারণেই ঐসব রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী শক্তির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। নিকারাগুয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপের কারণও ছিল মার্কিন সমর্থনপুষ্ট কোন সরকার প্রতিষ্ঠা। আর্থিক কারণও সংঘর্ষের অন্যতম উপাদান। লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের মুখ্য কারণ ঐসব রাষ্ট্রের অর্থনীতির উপর মার্কিন প্রাধান্য সুরক্ষিত করা।

অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো রাষ্ট্র নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নৌ-অবরোধ থেকে শুরু করে অন্যদেশের আমদানি এবং রপ্তানি বন্ধের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণ-বিদ্বেষী-নীতি প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেছিল। এর ফলে ঐসব রাষ্ট্রের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

কোন রাষ্ট্রকর্তৃক অন্যরাষ্ট্রের ওপর আক্রমণজনিত পরিস্থিতি থেকে বিরোধ সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রান্তবর্তী রাষ্ট্রসমূহের উপর দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের আক্রমনাত্মক ভূমিকা এবং বলপূর্বক নামিবিয়ার উপর প্রাধান্য বজায় রাখাকে কেন্দ্র করে শুধু আঞ্চলিক বিরোধই নয়, ঐ বিরোধ আন্তর্জাতিক রূপও ধারণ করেছে। আন্ত:রাষ্ট্রীয় বিরোধ বা সঘর্ষের ক্ষেত্রে জাতীয় মর্যাদা সম্মান রক্ষার উপাদানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বুলগেরিয়ার সীমান্তে দু'জন গ্রীক সীমান্তরক্ষী নিহত হবার ফলে ১৯২৫ সালে গ্রীক বুলগেরিয়া দখল করেছিল। ইরানে আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর নির্দেশে ইরান সরকার কয়েকজন মার্কিন নাগরিককে অন্তরীণ করেছিল। জাতীয় মর্যাদা রক্ষা করার জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেই বন্দীদের মুক্তি ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সংকীর্ণ জাতীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য গ্রেট বৃটেন আর্জেন্টিনার অন্তর্গত ফকল্যান্ড দ্বীপ দখল করেছিল। জাতীয় স্বার্থের সংঘাতেই হোল আন্তর্জাতিক বিরোধ এবং সংঘর্ষের প্রাথমিক কারণ। কোনো দেশই জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আন্ত:রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপন করে না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের সমন্বয় সাধন যত বাস্তব হয়ে ওঠে, আন্তর্জাতিক বিরোধও তত বেশি প্রশমিত হয়।

সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব (Cultural Conflict) ঃ

সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের সহজাত ধর্ম। আর এই সমাজবদ্ধ মানব জীবনে সংস্কৃতি মানুষের পরিচয় তুলে ধরে। আবার ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির অনুসারীরা পৃথক মূল্যবোধ ও আদর্শকে ধারণ করে। এমতাবস্থায় সমাজ জীবনে যখন দুই বা ততোধিক সংস্কৃতির

অনুসারী ব্যক্তিরা পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় একে অন্যের সান্নিধ্যে আসে তখনই সেখানে দেখা দেয় আদর্শ ও মূল্যবোধগত পার্থক্য। সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব হলো "A clashing of two or more culture" সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারন মানুষের যে ধারণা তা খুব বেশি সূক্ষ নয়। কেউ কেউ ধারণা করেন যে, সংস্কৃতি হলো কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, ধ্যান-ধারণা। কেউ বা মনে করেন সংস্কৃতি হলো আচার-অনুষ্ঠান, ভদ্রতা ও শিষ্ঠাচার এবং এ সম্পর্কীয় ভাবনা, ধারণা ও নিয়ম-নীতি আবার কারো কারো মতে ধর্মই হলো সংস্কৃতি। অন্যদিকে কেউ বা আবার অন্যকোন বিষয় যেমন- ভদ্রতা, শিষ্ঠাচার এগুলো মূখ্য হিসেবে বিবেচনা করেন এবং একেই কালচার বা সংস্কৃতি হিসেবে বিচার করেন।

সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব সর্বদাই যে শুধুমাত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই বা ততোধিক সংস্কৃতির অনুসারী ব্যক্তিদের মাঝে পরিলক্ষিত হয় তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে একই সংস্কৃতির অনুসারী ব্যক্তিদের মাঝেও দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বটা মূলত একই সংস্কৃতির অধীন উপ-সংস্কৃতিসমূহের (Sub-Cultures) মাঝে লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ বৃহত্তর সংস্কৃতির আওতাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কৃতিকে উপ-সংস্কৃতি হিসেবে ধরা হয়। আর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কৃতি তথা সাংস্কৃতিক ধারার অনুসারীদের মাঝে যে আদর্শ ও মূল্যবোধগত বিরোধ, অনৈক্য দেখা যায় সেটাও বৃহত্তর সংস্কৃতির মাঝে এক দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব স্থানীয় আঞ্চলিক, জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

সমাজের মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করলে ও তারা সকলে সর্বদাই যে একই রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ও আদর্শ এবং ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার অনুসারী এমনটি নয়। বরং একই সমাজেও মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন জীবন ধারার অনুসারী হতে দেখা যায়। আর সমাজে একই সাথে বসবাস করতে গিয়ে এই স্বতন্ত্র্য ও ভিন্ন ভিন্ন জীবনধারা তথা সংস্কৃতি যখন পাশাপাশি অবস্থান নেয় তখন তাদের মাঝে পারস্পারিক প্রতিযোগিতা এবং একে-অন্যকে দমন ও পরাজিত করার একটা প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়, যা থেকে জন্ম নেয় দ্বন্দ্ব। সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব হলো ঃ æConflict in which members of two groups in contact, each fairly homogencous culturally, and in competition dentify certain of their own cultural elements with the solidarity and continuity of the groups ethos; and in which, the corresponding traits of the æenemy" or æcompeting" culture considered dangerous efforts are made to overcome, suppress or eliminate them. Often used to include or describe cultural competition (q. V) in which without true conflict, alternate traits from the two cultures present choice for imitation and one or other pattern is selected for survival. Also called æConflict of values," (Nurul, 2007: 38). এখানে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের বিপরীতে মূল্যবোধের দ্বন্দ্বের কথাও বলা হয়েছে। সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের যে দিকটি আলোচ্য সংজ্ঞাতে বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়েছে তা হলো সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে একটি সংস্কৃতি অন্য কোন একটি সংস্কৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। সে ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বে একটি শক্তিশালী সংস্কৃতি অন্য একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে, যেখানে দুর্বল সংস্কৃতির অনুসারীরা শক্তিশালী ও প্রভাব বিস্তারকারী সংস্কৃতিটিকে অনুকরণ করতে চায়।

সমাজ প্রতিনিয়তই নতুন নতুন আবিষ্কার এবং এর নিজস্ব গতিধারায় পরিবর্তিত হচ্ছে। সমাজের এই নতুন নতুন আবিস্কার ও নানাবিধ পরিবর্তনের প্রভাব সমাজের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলেছে। পরিবর্তনের এই মাত্রাগত ভিন্নতার কারণে সমাজে আধুনিক ও সনাতন এ দুটি বিপরীতমুখী ধারার সৃষ্টি হচ্ছে এবং সনাতনের উপর আধুনিকের প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে দ্বন্দ্ব। এক্ষেত্রে জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা থেকে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে। উল্লেখ্য ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি অথবা একই সংস্কৃতির উপ-সংস্কৃতিসমূহের মধ্যকার এ দ্বন্দ্বসমূহ কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো বা পরোক্ষ আবার কখনো আংশিক এবং কখনো সামগ্রিক।

সমাজের সকল মানুষই কোন না কোন ধর্মের অনুসারী। মানুষের মাঝে ধর্মের কারণেও তাদের আচরণ এবং অভ্যাস ও মূল্যবোধগত পার্থক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে তাই যখন কোন উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে ভিন্ন ভিন্ন ও এর অনুসারীরা পাশাপাশি কিংবা মুখোমুখি অবস্থান নেয় তখন তাদের মাঝে এক মতানৈক্য কিংবা বিরোধিতা তথা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সম্পদ ও সুযোগের সুষম বণ্টনের অভাবে তৈরি হয় সামগ্রিক দ্বন্দ্ব। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা না থাকে তাদের মাঝে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

শিক্ষা মানুষের চিন্তা করার সার্থের পরিবর্তন ঘটায়। শিক্ষিত মানুষেরা জীবন সম্পর্কে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। কাজেই শিক্ষাগত পার্থক্যের কারণে শিক্ষিত সমাজের

মাঝে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়াও রাজনৈতিক আদর্শ লক্ষ্য ও কর্মসূচীর কারণে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে অনেক সময়ই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দ্বন্দ্ব ফুটে উঠে।

উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশকে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মূলত: দুর্বল সংস্কৃতির উপর শক্তিশালী অন্য কোন ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব এবং ধীরে ধীরে উক্ত দুর্বল সংস্কৃতির উপাদানগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে সেখানে শক্তিশালী সংস্কৃতির উপাদানসমূহকে প্রতিষ্ঠা করাকেই সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ হিসেবেই ধরা হয়। এতে করে দুর্বল ও প্রভাব বিস্তারকারী সংস্কৃতির মাঝে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সমাজে বিশেষ করে শহর সমাজে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে আমাদের স্থানীয় সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এ দুই সংস্কৃতির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই বড় ধরনের দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে (Dictionary of Sociology, 1959: 59)।

পারিবারিক দ্বন্দ্ব/বিরোধ (Family Conflict or Disorganization) ঃ

উন্নত ও শিল্পপ্রধান দেশ সমূহেই সর্বপ্রথম পারিবারিক বিশৃঙ্খলা সামাজিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়। তথাপি, তৃতীয় ও উন্নয়নশীল বিশ্বের কৃষিপ্রধান দেশসমূহেও সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বায়ন ও উন্নয়নের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় এ সমস্ত দেশেও পারিবারিক বিশৃঙ্খলা এক নতুন ধরনের সামাজিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পারিবারিক বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে Goode তাঁর æThe family" গ্রন্থে বলেন, The break up of a family unit dissolution or fracture of a structure of social roles when

one or more members fail (1980: 57-58). দক্ষিনাঞ্চলের সমাজব্যবস্থায় এখনও যৌথ পরিবার বিদ্যমান। Kashmiri pandits (Madan) matrilincal Nayars of kerala (Jeffrey) and patrilineal Multani Lohars (Rizvi) বৃটিশ কলোনিয়াল সময়ে ভারতের পারিবারিক-সামাজিক অবস্থানের প্রতি গবেষণা চালায়। এতে তাদের কাছে প্রমাণিত হয় যে, যৌথ অথবা সনাতনী প্রথায় পরিবারগুলোতে জমির মালিকানা/ভাগবাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা যায় (পৃ. ১৩)।

Social anthropologist T. N. Madan তাঁর ১৭৫৭-৫৮ সালে বৃহৎ আকারে পরিবার এবং তার সম্পর্কের উপরের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেন। তাঁর গবেষণায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, গৃহের ভিতরে "যৌথ চুলার" ভাগবাটোয়ারা নিয়েও পারিবারিক দ্বন্দ্ব দেখা যায় (Eng Dis, P-31)।

A.M Shah Rizvi তাঁর গবেষণায় বলেছেন যে, শিল্পায়ন, নগরায়ন ও বাণিজ্যিক প্রসারের ফলে আমাদের সনাতন পারিবারিক প্রথা ভেঙ্গে পড়েছে এবং ভাইদের মধ্যে পারিবারিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে।

In the Last selection G.N Ramu brings us back to contemporary times. He focuses a marital interaction and adjustment in urban nuclear families. His data comes from interviews with a random sample of 245 single and 245 dual earner couples (980 respondents in all) in Bangalore city. These were collected in two phases in 1979 and 1984. According to Ramu, marital

relations become meaningful only in their specific cultural context. Traditional religious values, ineffective laws, and insecure economic conditions perpetuate the wifes dependence on her husband. As a consequence she Shaun's marital conflict, let alone think of divorce as a means of resolving it.

রামুর মতানুসারে "পারিবারিক জীবন সুন্দর হয়ে উঠে পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমে। মূল্যবোধ ও ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে যদি পরিবারের সদস্যদের পারিবারিক জীবন পরিচালিত হয়, তবে পরিবারের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় থাকে"।

জ্ঞাতিদের ঝগড়া-দ্বন্দ্ব (Kinship quarrel – Conflict) ঃ

æKinship Conflict denotes a conflict either within the kinship group or between kinship obligations and those pertaining to competing institutional commitments" (Farber 1981:158).

গ্রামীন সমাজে জ্ঞাতিদের মধ্যে ঝগড়া-দ্বন্দ্ব বিরল ঘটনা নয়। বরং তা সচরাচরই চোখে পড়ে। ঝগড়ার প্রকৃতির যেমন বহুরূপ রয়েছে তেমনি ঝগড়ার বিষয় ও সব এক নয়, এরও বিভিন্নতা রয়েছে। এ সবের মধ্যে থেকে গ্রামীন সমাজে জ্ঞাতিদের মধ্যকার ঝগড়ার যে প্রধান বিষয়সমূহকে চিহ্নিত করা যায় তা হল ঃ সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা, সমাজ-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি, অর্থনৈতিক লেনদেন, গৃহপালিত পশু-পক্ষীর দ্বারা ফসলের ক্ষতিসাধন ইত্যাদি।

গ্রামের ঝগড়ার একটা প্রধানতম বিষয় হচ্ছে সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা (Property distribution)। ইহা প্রধানত: পিতৃ সূত্রীয় জ্ঞাতিদের মধ্যে বেশী সংঘটিত হয়। কোন পিতা মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধিকারদের মধ্যে এই ঝগড়া অধিক পরিমানে হয়ে থাকে। এই উত্তরাধিকারদের মধ্যে কেউ যদি অধিক পরিমাণ সম্পত্তি (আইন ও রীতি বহির্ভূত) দাবী করে উক্ত সম্পত্তি দখল করবার চেষ্টা করে বা উত্তরাধিকারদের মধ্যে প্রয়োজনীয় আলোচনা বা বাটোয়ারা বহির্ভূতভাবে কেউ (কোন উত্তরাধিকারী) সম্পত্তি হস্তান্তর করলে এই ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটে। সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া কখনও কখনও বংশ পরম্পর (generation after generation) চলতে থাকে।

পশু-পক্ষীর দ্বারা ক্ষেতের ফসলের ক্ষতিসাধন জ্ঞাতিদের মধ্যে ঝগড়ার আর একটা প্রধান কারণ। গ্রামে প্রায়ই এই ঝগড়া প্রত্যক্ষীত হয়। গ্রামের প্রায় প্রতিটি থানা বা পরিবারে কম-বেশী পশু-পক্ষী, যেমন- হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদি পালন করা হয়। এই সমস্ত গৃহপালিত পশু-পক্ষী যখন অন্যের ক্ষেতের (বসত বাড়ীর কাছাকাছি থাকতে প্রায়ই পিতৃ সূত্রীয় জ্ঞাতিদের) ফসল নষ্ট করে তখন তা নিয়ে ঝগড়া হয়ে থাকে।

জ্ঞাতিদের মধ্যে সমাজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি বিবাহ, মিলাদ, বাৎসরিক পার্বণ ইত্যাদি উদযাপন করতে গিয়েও অনেক সময় ঝগড়া বাধে। এইসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সময় তারা বয়স, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা সর্বোপরি সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে অনুষ্ঠানাদিতে তাদের ভূমিকা ও কৃতিত্ব দাবি করে। এসব যখন কোন জ্ঞাতি ঠিকমত না পায় বা বড়

ধরনের তারতম্য ঘটে তখন ঝগড়া বেধে যায়। অর্থনৈতিক লেনদেন যেমন- টাকা ধার, রাহানী (একটা চুক্তি যার মাধ্যমে প্রাণী হস্তান্তর করা হয়) জমি দেয়া-নেয়া, উৎপাদিত ফসলের বণ্টন ইত্যাদি জ্ঞাতিদের ঝগড়ার বেলায় বিশেষ কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়।

পক্ষপাতিত্ব (Partiality) জ্ঞাতিদের মধ্যকার ঝগড়ার কারণ প্রায়ই হয়ে থাকে। এই পক্ষপাতিত্ব ব্যাপারটা গ্রামে বিভিন্নভাবে প্রচলিত হয়, যেমন আতিথ্যতায় ভেদাভেদ (difference in hospitality) উপহার প্রদানে পার্থক্য (difference in giving gift) আদর বা স্নেহে তারতম্য (difference in showing love or affection) ইত্যাদি গ্রামীন জ্ঞাতিত্ব জিল্লুর [October-1999]।

জমির মালিকানা নিয়ে ঝগড়া (Land Ownership Conflict)ঃ

গ্রাম বাংলাদেশের সর্বত্র জমি সংক্রান্ত ঝগড়া সাধারণ এবং সুবিদিত ঘটনা। মালিকানার অধিকার নিয়ে ঝগড়াকে জমি হস্তান্তরের একটি মাধ্যম হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। পুত্রগণ, কন্যাগণ, স্ত্রীগণ এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ কি অনুপাতে জমির উত্তরাধিকার হবে সে বিষয়ে পরিষ্কার আইন থাকা সত্ত্বেও জমি ভাগাভাগি নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া বাঁধে। জমি ভাগাভাগি সময়ে পিতা কখনও তাঁর প্রিয় পুত্রকে বেশি অথবা ভাল অংশ দিয়ে থাকে। অসমবণ্টনের এ সকল ধরনের সবই পরবর্তী পর্যায়ে ঝগড়ার সৃস্টি হয়।

ঝগড়ার আর একটি ক্ষেত্র হলো উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বোনদের জমি। ভাইদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কারণে বোনেরা সাধারণত: তাদের জমি দাবি করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে তারা সে পরিমাণ সম্পত্তির মালিক তা তারা নেয় এবং এর ফলে একদিকে ভাইয়েরা এবং অন্যদিকে বোন এবং তাদের স্বামীদের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হতে পারে। দত্তক সন্তানদেরকে জমি দেয়ার ব্যাপারে ঝগড়া হতে পারে। যেসব পরিবারের প্রধানদের অনেক স্ত্রী তাদের সন্তানদের মধ্যে জমির ভাগবাটোয়ারা নিয়ে ঝগড়া হতে পারে।

পিতার অসময়ে মৃত্যু, সন্তানগণ নাবালক থাকলে সম্পত্তি অন্য কেউ নিয়ে যেতে পারে। পরবর্তীতে এসব সন্তান যদি শক্তিশালী হয়ে ওঠে তাহলে ঝগড়া-ঝাটি শুরু করতে পারে।

১৯৪৭ সনে ভারত ও পাকিস্তান ভাগাভাগি হওয়ার পর অনেক হিন্দু ভারতে চলে যায়। ১৯৫০ দশকে তাদের অনেক সম্পত্তিকেই "শত্রু" সম্পত্তি ঘোষণা করা হয় এবং "খাস" জমি সরকারি জমি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সরকার তাদের কাছ হতে সে জমি নেয় এবং খাস জমি ঘোষণা করে তা প্রায়ই ঝগড়ার সৃস্টি করে। এখানে ঝগড়ার কারণ প্রাক্তন মালিক বা অন্য লোক, যারা জমি পাওয়ার জন্যে পরস্পর-পরস্পরের বিরুদ্ধে ঝগড়া করে। কোন ব্যক্তি যদি জমির খাজনা না দিয়ে থাকে সরকার সে জমিকে খাস জমি ঘোষণা করতে পারে এবং জমির মালিককে উৎখাত করতে পারে। চর জমি, যে কৃষি জমি অনেক নদীর ধারে গিয়ে পলি জমতে জমতে জেগে ওঠে। প্রায়ই সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়

এবং খাস জমির মর্যাদা দেয়া হয়। কোন কোন পুকুর এবং ছোট ছোট বাঁশের ঝাড় যাদের উপর কোন পরিষ্কার ব্যক্তি মালিকানা নেই তাদেরকেও খাস জমি ঘোষণা করা হয়।

ছোট ছোট আল দ্বারা কৃষি জমি বিভক্ত যা একজন মানুষের জমির সীমানা নির্দেশ করে। কখনও কখনও মাত্র কয়েক ইঞ্চি উচুঁ এবং কয়েক ইঞ্চি প্রশস্ত মাটির রেখা দ্বারা সীমানা নির্দেশ করা হয়। আবার কখনও কখনও সীমানা নির্দেশ করার জন্যে এমনকি কোন দৃশ্যমান রেখাও থাকেনা। নির্মিত আলের ধরন জমির স্তরের উপর নির্ভর করবে। জমি সমতল করার প্রয়োজনে জমি হতে মাটি সরানোর প্রয়োজন হলে বড় বড় আল নির্মাণ করা হতে পারে। আবার সাধারণের পথ হিসেবে ব্যবহারের জন্যেও বড় বড় আল নির্মাণ এবং সংরক্ষণ করা হতে পারে। দুটি জোতের মধ্যে অবস্থিত আলের উপর বিরোধ অত্যন্ত সাধারণ।

চর জমি নিয়ে বিরোধ অত্যন্ত সাধারণ। বর্ষাকালে নদীর অতি প্রবাহ এবং বন্যার কারণে যা জমি ডুবিয়ে এবং ভেঙ্গে দেয়, প্রতি বছর অনেক কৃষি জমি হারিয়ে যায়। অনেক বছর পর, নদী যখন তার গতিপথ পরিবর্তন করে অথবা ছোট হয়ে আসে সংগৃহীত পলি হতে নদীর পাঁড় ঘেঁষে অথবা নদীতে দ্বীপের ন্যায় জমি আবার জেগে উঠতে পারে। পুনরায় জেগে ওঠা জমি যেহেতু বছরের পর বছর এবং এমনকি দশকের পর দশক পানির নীচে থাকে এবং যেহেতু কোন গ্রামের হারিয়ে যাওয়া জমি বিভিন্ন অঞ্চলে জাগতে পারে, সেহেতু চর জমির মালিকানার অধিকার নিয়ে অনেক বিরোধ আছে।

কোন নির্দিষ্ট জোতের উপর মালিকানা প্রমাণ করার জন্যে তিন ধরনের দলিল থাকা প্রয়োজন। যদি এসব দলিল একজন ব্যক্তির নামে থাকে, তাহলে বিবেচনা করা যায় যে, জমির মর্যাদা অত্যন্ত নিরাপদ এবং ন্যায়ত যৌক্তিকতার মাধ্যমে এর দাবী করা কঠিন হয়ে পড়ে। জোতের পুণ:রেজিস্ট্রেশনের সময়টিই জমির মালিকানা অধিকারের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় যেমন পরিবার প্রধানের মৃত্যুর পর পরিবারের মধ্যে বণ্টনের সময় কখনও ঘটে থাকে পরিবারের প্রভাবশালী সদস্যগণ কখনও উত্তরাধিকার আইনানুসারে তাদের যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি জমি তাদের নামে রেজিস্ট্রি করে নেন। কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তির নামে জমি একবার রেজিস্ট্রি হযে গেলে, প্রকৃত অথবা ভূঁয়া খাজনা রশিদ এবং জমি রেকর্ড করার কাগজপত্র যোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়ে।

গ্রাম্য রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব (Village Political Conflict)ঃ

সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দেখা যায়। Rural polity refers to the power of taking decisions in different matters of social and economic matters in rural areas. Andre Batiell said that the local Politics in village is dominated by caste, class and power [Rural sociology-RAJENDRA KUMAR SHARMA-198].

গ্রামে ক্ষমতার উৎস দুটি অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক। তাই গ্রামের রাজনীতি অভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত। ক্ষমতার অভ্যন্তরীন উৎস হচ্ছে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ উচ্চ সামাজিক মর্যাদা, ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যক্তির

দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গুনাবলি, সমাজ সেবা, বিচক্ষণতা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা সঞ্চয়ে সহায়ক শক্তির ব্যবহার ইত্যাদি। বাহ্যিকভাবে ক্ষমতার উৎস হলো রাজনৈতিক দলসমূহ কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব (যেমন এমপি) ত্রাণ সামগ্রী বিতরণকারী সংস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ, কোন উচ্চস্তরের প্রশাসনিক ও পুলিশ অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ এবং এ ধরনের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। এসব কিছু কোন ব্যক্তিকে (গ্রামের বাইরে থেকে) ক্ষমতাশালী করতে সাহায্য করে। নিকোলাস তাই ঠিকই বলেছেন, 'রাজনৈতিক ক্রিয়া-কর্মের সম্পদ দুটি বস্তুগত এবং মানবিক'। বস্তুগত সম্পদ হলো অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু যেমন- টাকা-পয়সা, যন্ত্রপাতি, মালামাল, জমিজমা, খনি ইত্যাদি। এসব কোন ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য সাধনে সামাজিক ক্রিয়া-কর্মে লাগাতে পারে। মানুষের কিছু আচরণ হলো মানসিক সম্পদ যা ক্ষমতাবান ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে (নিকোলাস, ১৯৬৯ ঃ ৩০০-৩০১)।

Somjee, The author of the book æDemocracy and political change in village india 1971" Studied the political system before democracy and after democracy. Before democracy in village Panchayet upper caste persons played dominant role. Lower caste was having no say in village panchayet. Members were belonging to high cate cente, old age and high economic status. In panchayet decision were taken unanimously.

স্থানীয় প্রশাসন এবং বিচার সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের দায়িত্ব ছিল ইউনিয়ন কাউন্সিলের উপর। ইউনিয়ন কাউন্সিল গ্রাম পুলিশের ব্যবস্থা করতো। কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি,

সমাজসেবা এবং জাতীয় পুনর্গঠন সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব একে নিতে হতো। রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি ছিল এর গুরত্বপূর্ণ কর্মসূচীর অন্যতম।

১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান দেশকে একটি নতুন শাসনতন্ত্র দেন। এতে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মৌলিক গনতন্ত্রীরা ছিল গ্রামের নতুন একটি সম্প্রদায় যারা তদানীন্তন সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় জন্মলাভ করে। এই নতুন এলিটদের দুর্নীতি প্রিয়তোষ এবং স্বজনপ্রীতি দ্বারা পরিপুষ্ট করা হয়েছিল এবং এতে গ্রামের জনসাধারনের শোষণ বেড়ে গিয়েছিল। তাদের ঘুষ দেয়ার উদ্দেশ্যে আয়ুব সরকার গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী নামে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। গ্রাম উন্নয়নের নামে এসব ইউনিয়ন সদস্যদের লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের টাকা ত্রাণ সামগ্রী ও অন্যান্য অনুদান আত্মসাৎ এবং প্রেসিডেন্ট ও আইনসভায় নির্বাচনকালে নগদ দেয় অর্থে এসব লোক রাতারাতি প্রচুর সম্পদশালী হয়ে উঠল। এদের প্রায় সকলেই ছিল অশিক্ষিত এবং অনেকেরই পেশা ছিল দালালী ও ফটকাবাজী। তাদের পক্ষ সমর্থন করে যে কেউ তাদের সহানুভূতি অর্জন করতে পারত।

১৯৬৯ সালে বাংলাদেশে এক বিরাট গণআন্দোলন শুরু হয়। যার মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে পদত্যাগ করতে হয়। গ্রাম এলাকায় এই আন্দোলন ছিল দুর্নীতি অবিচার ও অনাচারের প্রতীক ইউনিয়ন কাউন্সিলের সভাপতি ও সসদস্যদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এর যুদ্ধবিদ্ধস্ত এবং দুর্ভিক্ষগ্রস্থ মানুষকে সাহায্য করার জন্য আন্তর্জাতিক

রেডক্রস সোসাইটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন ও সংস্থা তথা অনেক বিদেশী রাষ্ট্র এগিয়ে আসে। তারা টাকা এবং দ্রব্যাদিতে প্রচুর ত্রাণসামগ্রী প্রদান করে। এসব সংস্থার বেশির ভাগই সরকারের সাহায্যে এবং কিছু কিছু সংগঠন প্রত্যক্ষভাবে স্থানীয় লোকের সাহায্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরনের কাজ করে। সরকারীভাবে প্রদত্ত ত্রাণসামগ্রী ইউনিয়ন পর্যায়ে ত্রাণ কমিটি দ্বারা বণ্টন করা হয়। ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে ত্রাণ কমিটির চেয়ারম্যান গ্রামের জনসাধারনের জন্য দেয়া ত্রাণ সামগ্রী টাকা পয়সার সিংহভাগই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দ আত্মসাৎ করেন।

গ্রামের রাজনৈতিক অবস্থান মূলত তৈরি হয় চায়ের দোকান, কোন ক্লাব ঘর অথবা রাস্তার মোড়ে মোড়ে বন্ধুদের আড্ডা থেকে। সারাদিন খেটে খাওয়া মানুষেরা সন্ধ্যে হলে চায়ের দোকানে এসে বিভিন্ন খবর জানতে চায়। খবর মানে রাজনীতির খবর, দেশের খবর, ঢাকার খবর। গ্রামের দোকানে যারা নিয়মিত আড্ডা মারে তাদের অন্যতম আকর্ষণ রাজনীতি, দেশীয় রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি। বিভিন্ন দেশের রাজনীতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বোধ হয় এইসব দেশের সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী। ড. নজরুল ইসলাম তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে গ্রামে বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যায় কোন এক দোকানের অভিজ্ঞতা থেকে জানালেন, দোকানে উপস্থিত অনেকেরই আগ্রহ ছিল শেখ হাসিনার লন্ডন ভ্রমণ। ওখানে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা যা দেশের জন্য, জনগণের জন্য সুখকর নয়। ওরা আলোচনা করতে চেয়েছিল ঢাকার প্লট বণ্টন কেলেঙ্কারি। অমানবিক পন্থায় পতিতা পল্লী উচ্ছেদ, ট্রানজিট প্রদান, ঢাকার বস্তি উচ্ছেদ, সচিবালয়ে কর্মচারী আন্দোলন কুকুর বাহিনী দিয়ে দমন, ওসমানী উদ্যানের গাছ রক্ষা আন্দোলনসহ আরো অনেক বিষয়। তারা

আলোচনা করে বি.এন.পি আমলে এলাকার উন্নয়নের সাথে আওয়ামী লীগ আমলের উন্নয়নের তুলনামূলক আলোচনা। আলোচনায় উপস্থিতির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যেতে থাকে, উপস্থিত হয় ২/১ জন ঠিকাদার ও শ্রমিক সর্দার। এরা এলাকার যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজের খবরা-খবর রাখেন। তারা জানালেন যে, বিগত বি.এন.পি আমলে বেলকুচি-কামারখন্দ নির্বাচনী এলাকায় ব্যাপক পাকা রাস্তা বানানো হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এলাকায় রাস্তা ঘাটের যে উন্নয়ন হয়েছে তারও একটা হিসাব পাওয়া গেল উপস্থিত ঠিকাদার ও শ্রমিক সর্দারের নিকট থেকে। তারা জানালেন যে, বি.এন.পি আমলে সকল উন্নয়ন কাজের টেন্ডার ঠিকাদারদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বণ্টন করা হত। কিন্তু বর্তমান সময়ে সবকাজ এম.পি সাহেব নিজে ভাগ করে দেন। তার নিজের লোক ছাড়া এলাকার কোন ঠিকাদার এ পর্যন্ত কোন কাজ পায়নি (জিল্লুর, ১৯৯৯: ৭৫)।

আসলে গ্রামের লোকেরা জানতে চায় শহরের কথা। শহরের রাজনীতি, শহরের আন্দোলন, প্লট কেলেঙ্কারী, শেয়ার কেলেঙ্কারী, টানবাজারের পতিতালয় উচ্ছেদ, বস্তি উচ্ছেদ, ওসমানী উদ্যান, সচিবালয়ের আন্দোলন ও কুকুর বাহিনী দিয়ে আন্দোলন দমন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার সমর্থক ধর্ষকগ্রুপ ও কিলার গ্রুপের কথা। কিন্তু তারা নিজেরা বোধ হয় অনুধাবন করতে পারে না যে, এর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত তাদের নিজের এলাকায়। অন্যায়, অবিচার, কেলেঙ্কারী, ঘুষ, দুর্নীতি, শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে গ্রামাঞ্চলে। সরকারের উন্নয়ন দাবী, ঘুষ দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন, দারিদ্র্য জনগণের অধিকার, সমাজে ন্যায়-নীতির প্রতিষ্ঠা, সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্ন প্রভৃতি যেকোন অবয়বে

প্রকাশ পাচ্ছে গ্রামের এসব মানুষের উপস্থিত বর্ণনা থেকে ভেসে উঠে তার করুণ চিত্র (জিল্লুর, ১৯৯৯: ৮৫)।

৩. গ. দ্বন্দ্বের শ্রেণীবিভাগ

দ্বন্দ্ব অনেক ধরনের হতে পারে। আমাদের জীবনে এমন কতগুলো দ্বন্দ্ব সংঘটিত হতে পারে যেগুলো সহজ ধরনের যা মিমাংসা করা খুব কষ্টসাধ্য নয়। আবার এমন কতগুলো দ্বন্দ্ব সংঘটিত হতে পারে যেগুলো আমাদের জীবনের উপর বেশ তীব্র চাপ সৃষ্টি করে।

কার্ট লিউইন (Kurt Lewin)-এর ভাষায় æThe behaviour of the individual was seen as determined by a field of psychological forces. These forces were dependent, in part, on the positive and negative valences attached to various goals in the situation. Conflict was thought to arise when the forces relevant to two or more goals were of equal strength" (The Social Science Encyclopedia, 1996: 221).

Lewin distinguised between three types of conflict:

1. Where a person is between two goals of positive valence, that is Approach – Approach conflict.
2. Where a person is between two goals of negative valence. Avoidance – Avoidance conflict.

3. Where a person faces a goal with both positive and negative valence: Approach – Avoidance, conflict.
4. A fourth type has been added, Double approach – Avoidance conflict (The Social Science Encyclopedia, 1996: 221).

১. আকর্ষণ আকর্ষণ দ্বন্দ্ব ঃ অনেক সময় দেখা যায় আমরা দুটি ধনাত্মক শক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হয়েছি অর্থাৎ সমান আকর্ষণকারী লক্ষ্যের মাঝখানে উপস্থিত হয়েছি। তখন আমাদের মধ্যে আকর্ষণ আকর্ষণ দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। যেমন একজন যুবক বিয়ের জন্য একটি সুন্দরী কন্যা ও একটি ধনবর্তী কন্যার সমান আকর্ষণের মধ্যে পড়ে হিমসিম খেতে পারে, সে কোন কন্যাকে বিয়ে করবে? এই ধরনের অবস্থাকে বলা হয় আকর্ষণ আকর্ষণ দ্বন্দ্ব।

২. বিকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব ঃ আমাদের জীবনে আমরা অনেক সময় এমন অবস্থায় পড়ি যখন দুটি অযাচিত বস্তুর মধ্যে একটিকে গ্রহণ করতে হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় বিকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব। এটি প্রকৃতপক্ষে উভয় ধরনের সঙ্কটের মধ্যে পড়া। যেমন একজন কলেজ ছাত্রকে দুটি নির্বাচনী বিষয় গণিত ও অর্থনীতির মধ্যে একটিকে অবশ্যই নির্বাচন করতে হবে অথচ সে দুটির একটিকেও পছন্দ করে না।

আরেকটির উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে একটি শিশু স্কুলে যেতে চায়না অথচ বাড়িতে থাকলে বাবার মার বকুনি খেতে হয়। এভাবে বিকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব একটি জটিলতার দ্বন্দ্ব।

৩. আকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব ঃ এ দ্বন্দ্বটিও মানবজীবনে অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে। যেমন একটি লক্ষ্যবস্তুতে আকর্ষণীয় গুণ ও বর্জনীয় গুণ দুটিই একসঙ্গে বর্তমান থাকে। লক্ষ্য

বস্তুটি একদিকে যেমন আকর্ষণ করে অন্যদিকে আবার বিকর্ষণও করে। এই ধরনের লক্ষ্যবস্তু সাধারণত একইসঙ্গে কাছেও টানে দুরেও ঠেলে। একটি বেশি বেতনের চাকরি পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সেটি অনেক দূরের জায়গায় সেখানে আমি যেতে চাই না।

একটি বিয়ের পাত্র পাওয়া যাচ্ছে, দেখতে সুন্দর কিন্তু চরিত্র ভাল নয়। আমাদের বরের জন্য একটি কন্যা পাওয়া যাচ্ছে উচ্চশিক্ষিতা কিন্তু দেখতে কুৎসিত।

আকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব মানব জীবনে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়। ছোটবেলা থেকে শেখানো হয় পাড়া-প্রতিবেশি আত্মীয়স্বজন সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে চলবে, বড়দেরকে ভালবাসবে অথচ এই প্রতিযোগিতামূলক সমাজ ব্যবস্থায় প্রায়ই দেখা যায় পাড়া প্রতিবেশিদের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন দ্বন্দ্ব বা বিবাদ লেগেই আছে। আত্মীয় স্বজন ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পত্তি ও বিষয়াদি নিয়ে বিভিন্ন রকমের দ্বন্দ্ব লেগেই আছে।

দ্বৈত আকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব ঃ এই প্রকার দ্বন্দ্বে ব্যক্তির সামনে দু'টি কর্মপন্থা, গন্তব্যস্থল বা বস্তু আছে এবং তাকে দু'টির একটিকে নির্বাচন করতে হবে। এ দুটির প্রত্যেকটির সাথে ভাল বা মন্দ জড়িত রয়েছে। ভালো দিকটি তাকে আকর্ষণ করবে এবং মন্দ দিকটি তাকে বিকর্ষণ করবে। যেমন একজন অবিবাহিত মেয়ে দূরবর্তী শহরে একটি চাকুরী পেয়েছে আবার নিজেও তাকে টানছে। নতুন শহরে চাকুরীর রোমাঞ্চের সাথে কিছু অনিশ্চয়তা ও ভয় আছে; বিয়ে করলে তাকে একটি ক্ষুদ্র বাসগৃহে থাকতে হবে। এই অবস্থায় মেয়েটি দ্বৈত বা দ্বিগুণ আকর্ষণ বিকর্ষণ দন্দ্বে ভুগবে। মেয়েটির সামনে দুটি লক্ষ্য উপস্থিত।

একটিকে নিলে আর একটিকে বাদ দিতে হয় অথচ দুটিরই ভাল ও মন্দ দিক সমান জোড়ালো। এ অবস্থায় ব্যক্তির দ্বিধা ও দোদুল্যমানতা এক সময় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী এ বিভিন্নভাবে দ্বন্দ্বকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Marx Weber এর মতে, æIt is action oreinted, intentionally to carrying out the actor's own will against the resistance of the other party or parties" (1947: 132).

Lewis Coser æSocial Conflict may be defined as a struggle over values or claims to status, power and scarce resources, in which the aims of the conflict groups are not only to gain the desired values, but also to neutralize, injure or eliminate rivals" (1967: 232).

দু'জনের সংজ্ঞাকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে ঈড়ংবৎ এর দ্বন্দের সংজ্ঞা আমাদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। Weber দ্বন্দ্বের সংজ্ঞাকে একটি সাজেশন আকারে রূপ দিয়েছেন। তার সংজ্ঞাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। A theory of conflict ought also to encompass situations in which divergent interests and disagreements over values can be resolved without necessarily intending or bringing injury and burn to ones opponents.

অন্যদিকে Coser-এর দ্বন্দ্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা যায়, The aims of the conflict groups are to gain the desired values, and the consequence of the struggle is

frequently the neutralization, injury or elimination of the rival groups আমাদের এ গবেষণায় আমরা Obeerschall পরিমার্জনসহ Coser-এর সংজ্ঞা গ্রহণ করেছি যেমন Conflict will mean a struggle over values or claims to status, power and scarce resources and the consequence of the struggle may result in the neutralization, injury or elimination of the rival groups.

গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল তাঁর সুপ্রসিদ্ধ "দ্যা পলিটিক্স" গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে গ্রীক রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের বিশৃঙ্খলার ফলে রাষ্ট্রে অভ্যন্তরে যে নানা রকম দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায় তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। "নগর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক জীবনে এত দ্রুত সরকার পরিবর্তনের ফলে মানব জীবনে চরম হতাশা বিরাজ করে। আর এই হতাশা থেকেই সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব (১৯৯৯: ২১৩)।

"রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সাংবিধানিক পরিবর্তনের ফলে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করলে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। আবার সমগ্র সরকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব না ঘটিয়ে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কোনো নির্দিষ্ট সংস্থা বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধেও বিপ্লব ঘটতে পারে" (প্রাগুক্ত)।

এরিস্টটল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বন্দ্বের আরো ছোট ছোট কয়েকটি দিক তুলে ধরেছেন।

১. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা দেখা দিলে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে।

২. রাষ্ট্রীয় তথা সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার হলে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে।

৩. সমাজে স্থায়িত্ব এবং ভারসাম্য রক্ষাকারি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুপস্থিতি হলে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে।

৪. সমাজে চরমপন্থী ঐতিহ্যসমূহের মধ্যে যথার্থ রাজনৈতিক ক্ষমতা ধারণ করিবার যোগ্যতা এবং যথার্থ রাজনৈতিক ক্ষমতা যারা কার্যকর করে সেই ব্যাপারে কোনো গরমিল দেখা দিলে দ্বন্দ্ব দেখা যেতে পারে।

তাছাড়া দ্বন্দ্বের কতগুলি বিশেষ কারণের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

ক) শাসক শ্রেণীর অত্যাধিক ধন-লিপ্সার ফলে জনগণের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এর ফলে সূত্র হয় দ্বন্দ্বের।

খ) রাষ্ট্রে যোগ্য ব্যক্তিরা সম্মান থেকে বঞ্চিত হলে এবং অযোগ্য ব্যক্তিরা তা ভোগ করলে যোগ্য এবং অযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব।

গ) শাসক বর্গে চক্রান্তের ফলেও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

ঘ) ভয়-ভীতি হতেও অনেক সময় দ্বন্দ্ব দেখা যায়।

ঙ) দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা শাস্তির ভয়ে অযথা রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে।

সাম্প্রদায়িক কলহ, বংশগত এবং পারিবারিক সংঘাত, ক্ষমতালোভী প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক কলহ, নির্বাচনে দুর্নীতি এবং শাসক বা শাসক চক্রের

অসতর্কতা প্রভৃতি কারণেও দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়। রাজতন্ত্রে রাজ পরিবারের আভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে দ্বন্দ্ব ও কলহ দেখা দিতে পারে। রাজা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলে জনগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ধনিকতন্ত্রে মুষ্টিমেয় বিত্তবান ব্যক্তিদের শোষণের বিরুদ্ধে সমগ্র জনগণ বিদ্রোহ করে। গণতন্ত্রে অত্যধিক জনপ্রিয় নেতাদের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অভিজাততন্ত্রে মুষ্টিমেয় শ্রেণীর শোষণের ফলে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। আর স্বৈরতন্ত্রে শাসক শ্রেণী জনগণের উপর চরম অত্যাচার ও নির্যাতন চালায় ফলে দেখা যায় দ্বন্দ্ব।

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দ্বন্দ্বকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হেগেলের মতে, "মানব সভ্যতার অগ্রগতি কখনও সরাসরি ঘটে নাাই। ইহা আকা বাঁকা পথে ক্রমশ অগ্রসর হয়েছে। যেকোন সত্য ধারণা অবশ্যই ক্রিয়াশীল এবং গতিশীল হবে। ইহা অবশ্যই বিবর্তনমুখী হবে। প্রত্যেক সত্য ধারণা অবশ্যই বিবর্তনমুখী হবে। প্রত্যেক ঐতিহাসিক শক্তি ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে এমন এক বিরোধী শক্তির সৃষ্টি করে যাহা প্রথমোক্ত শক্তির বিনাশ সাধন করে। এই উভয়ের মধ্য হইতে পরিশেষে এক নতুন শক্তির উদ্ভব হয় যাহা ঐতিহাসিক ও বিরোধী শক্তি সমন্বয়ে গঠিত। হেগেল ইহাকে যথাক্রমে বাদ (Thesis) প্রতিবাদ (Anti-thesis) এবং (Synthesis) বলে আখ্যায়িত করেছেন।"

জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস হেগেলের দ্বন্দ্ববাদকে আদর্শবাদী ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁর পরিবর্তে তিনি দ্বন্দ্ববাদের একটি বাস্তববাদী ও বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। মার্কস

বিশ্বাস করতেন যে "স্থবির জগত সত্যিকার জগত নহে। জগতের সকল বস্তুই পরিবর্তনশীল এবং বাস্তব জগত সর্বদাই গতিশীল এবং বিবর্তনশীল। মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক অর্থনৈতিক শ্রেণীসমূহে প্রতিফলিত হয় যা পরবর্তীকালে বাদ এবং বিস্বাদে পরিণত হয়।" দ্বন্দ্ব চিন্তাকে মার্কস এভাবে ব্যাখ্যা করছেন "Dialecties is the science of the general laws of motion both of the external world and of human thought" (1972 : 476)। ধনী কৃষকরা বৃহৎ অংকের জমির মালিক। তারা মজুরী শ্রমিক অথবা বর্গদার নিয়োগ করে থাকার জন্য ধনী অথবা মধ্য কৃষকদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা এবং ধনী কৃষকদের আধিপত্য দেখতে পাই। এভাবে আমরা দেখতে পাই এক গুচ্ছলোক (ধনী কৃষক, গরীব কৃষক ও ভূমিহীন) ক্লায়েন্ট প্যাট্রন (আধিপত্য-আনুগত্য) সম্পর্কে সম্পর্কিত।

কেনেথ ই. বোল্ডিং (Kenneth E. Boulding) অবশেষে Conflict সম্পর্কে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় It is found everywhere in the world of man, and all the social sciences study it. Economics studies conflict among economic organization – firms, unions, and so on. Political science studies conflict among states and subdivision and departments within larger organization. Sociology studies conflict within and between families, racial and religious conflicts and conflicts within and between groups. Anthropology studies conflict of cultures. Psychology studies conflict within the person. History is largely the record of conflicts. Even Geography studies the endless war of the sea an important part of the specialized stude of insustrial relations, international relations or any othe relations" (1962 : 1). সামাজিক নিয়মকানুন

মূল্যবোধ ও দ্বন্দ্বের কারণস্বরূপ কাজ করে। তাই সামাজিক দ্বন্দ্ব জানার পূর্বে আমাদের সমাজ সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা দরকার।

সমাজের সংজ্ঞা ঃ সমাজ মূলত একটি সংগঠন। এটি গঠিত হয় বিভিন্ন ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সমন্বয়ে। পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বসবাস করতে গিয়ে সমাজ নামক সংগঠনটি গড়ে উঠে। কয়েকটি ধারণার মাধ্যমে সমাজকে রূপায়িত করা যায়।

ক) মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সমষ্টিই হচ্ছে সমাজ।

খ) সমাজ মূলত এমন একটি মানবগোষ্ঠী যারা পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে এবং সমাজের নানাবিধ প্রথা-প্রতিষ্ঠানের কার্য পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

গ) সমাজ বলতে সামাজিক জীবন এবং সামাজিক কার্যাবলীর সমষ্টিকে বুঝায়।

ঘ) সমাজ বলতে সমাজবদ্ধ জনসমষ্টিকে বুঝায়।

সমাজের একটি বিশ্লেষণধর্মী সংজ্ঞা দিতে গিয়ে MacIver বলেছেন, Society means cooperation, society is the exact antithesis of war. War means mutual destructiveness, while society means mutual constructiveness.

MacIver-এর মতে সমাজ অর্থ সহযোগিতা। কিন্তু জার্মান দার্শনিক কার্লমার্ক্স এ ধারণার সঙ্গে একমত নহে। তাঁর মতে "পুঁজিবাদী সমাজে সহযোগিতার বিপরীত অবস্থা বিরাজ করে। শ্রেণী সংঘাত রয়েছে বলে মার্ক্সীয় মতবাদে উল্লেখ করা হয়। অতএব সমাজ বলতে সহযোগিতা এবং সংঘাত উভয়কেই বুঝাতে পারে। সমাজের মধ্যে একইসঙ্গে মিলন বিরোধ বর্তমান থাকতে পারে" (রহমান, ৫৪-৫৫)। সমাজ সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনার

পর আমাদের গ্রামীন সমাজ কেমন সেই সম্পর্কে ধারণা নেয়া যেতে পারে। সমাজ বৈশিষ্ট্য সম্প্রসারিত এবং জ্ঞাতি গোষ্ঠী হতে পৃথক। কিন্তু গ্রামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। এই জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিবাহ, ধর্মীয় উৎসব, আচার, রীতিনীতি ইত্যাদি পালন করা হয়ে থাকে।

পাড়া ঃ পাড়া গ্রামের একটি প্রধান উপাদান একই পাড়াতে দেখা যায় বিভিন্ন বংশ, বিভিন্ন শ্রেণী, বিভিন্ন পেশা, ধনী, কৃষক ও গরীব কৃষক শ্রেণী বিরাজমান।

বার্টুচী (আমেরিকার বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী) বাংলাদেশের পূর্ব অংশে অবস্থিত কুমিল্লা জেলার হাজিপুর ও তিনপাড়া গ্রামে তাঁর ফিল্ডওয়ার্ক পরিচালনা করে মন্তব্য করেছেন যে, গ্রামে সরদার (উচ্চবংশের প্রভাবশালী ব্যক্তি) এবং রেয়াই (আশ্রিত ব্যক্তি) ভিত্তিক একটি বহু গ্রামীন রাজনৈতিক এককও বিরাজমান। গ্রামের মধ্যে রেয়াইরা অনেক সরদারের মধ্যে কোনো একজন সরদারের প্রতি অনুগত থাকে। আবার কোনো কোনো গ্রামে কোনো একক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ, সমবায় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বুঝানো হয়ে থাকে।

গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই মূলত গ্রামীন সমাজ গড়ে উঠে। গ্রামের এই অর্থনৈতিক কাঠামোকে সাধারণত চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ধনী শ্রেণী, মধ্য শ্রেণী, গরীব শ্রেণী, ভূমিহীন শ্রেণী।

কিছু গৃহস্থালী স্বচ্ছল এবং কিছু গৃহস্থালী অস্বচ্ছল। তবে তারা একই গ্রামের মধ্যে সমাজেই বাস করে। মূলত গ্রামের গরীব কৃষক বর্গাদার এবং দিন মজুররা খুব দুর্বল। তারা সামাজিকভাবে গ্রামের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না।

গ্রামের সামাজিক গ্রুপের একটি চিত্র দেওয়া হল।

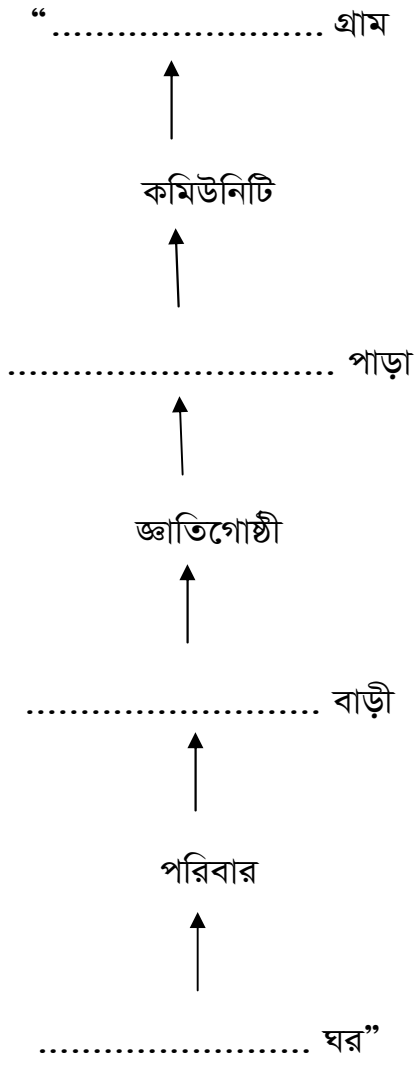

এছাড়া একটি গ্রামে বহুধরনের পেশার লোক বাস করে। যেমন স্কুলশিক্ষক, পোষ্টমাস্টার, দোকানদার, ডাক্তার, জেলে, মুচি, টেইলর, কুমার, ছুতার, মিস্ত্রী, কারিকর ইত্যাদি।

৩. ঘ. সামাজিক দ্বন্দ্বের কারণ

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে conflict কে বর্ণনা করতে গিয়ে The Social Science Encyclopedia উল্লেখ করেছেন যে, æSocial conflict may be defined as a struggle over values or claims to status, power and scarce resources, in which the aim of the conflicting parties are not only to gain the desired values but also to neutralize, injure, of eleminate their rivals. Such conflict may take place between individuals, between collectivities, or between individuals and collectivities. Intergroup as well as intragroup conflicts are perennial features of social life" (1996: 223).

সামাজিক দ্বন্দ্ব বিভিন্ন কারণে হতে পারে ঃ

The Objective Bases of Conflict: Objective bases of conflict মূলত বৃহদাকার। এই দ্বন্দ্বগুলো ঘটে থাকে বিভিন্ন ধরনের সম্পদের ভাগ এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে। যেমন আয়, মর্যাদা, শক্তি, domination over teritory of ecological position। আচরণগত দিক থেকেও সাধারণত অনেক দ্বন্দ্ব ঘটে থাকে। যেমন রুঢ় আচরণ, উত্তেজিত আচরণ

(aggressiveness, ressentment, hatred and the like). এছাড়া বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। যেমন আধুনিক শ্রমব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে Labour conflict.

The Structural Impact of conflict: কাঠামোগত দ্বন্দ্বের মধ্যে দেখা যায় যে এখানে দ্বন্দ্বটা হয় সাধারণত একটি গ্রুপের মধ্যে আবার এক গ্রুপের সাথে অন্যগ্রুপের মধ্যে। Ideology and Conflict: একটি সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লোক থাকে। সেখানে বিভিন্ন পেশার লোক থাকে। আবার বিভিন্ন দলের এবং বিভিন্ন পেশার লোকদের বিভিন্ন মতাদর্শ থাকে। এই বিভিন্ন মতাদর্শগত কারণের ফলে তাদের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। যেমন একই গ্রামে বিভিন্ন পাড়ায় বিভিন্ন পূজা পার্বণ, বিভিন্ন আচার আচরণ, রীতিনীতি নিয়ে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

Anthropological দৃষ্টিভঙ্গিতে, æConflict results from competition between at least two parties. A party may be a person, a family, a lineage, or a whole community, or it may be a class of ideas, a political organization, a tribe, or a religion. Conflict is occasioned by incompatible desires or aims and by its duration may be distinguished from strife or angry disputes arising from momentary aggravations. It is safe to assume that some of the causes of conflict are to found in the aggressive behaviour that is almost universal among the vertebrates and is presmably adaptive in a board range of environments. The function of much conflict appears to be the control of food and reproduction through the control of territory and the maintenance

of well-organized dominance hierarchies that serve to reduce the amount of earning in a group" (The Social Science Encyclopedia, 1996: 236).

অধ্যায় ৪

বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প পন্থা

৪. ক. বিকল্প ব্যবস্থার পরিচয়

Alternative Dispute Resolution (ADR) অর্থ বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা। এটি প্রধানত দেওয়ানী মোকদ্দমায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তে পক্ষগণের মধ্যে আপোষ মীমাংসার সনাতন পদ্ধতিই æADR" রূপে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে পক্ষগণ ব্যক্তিগতভাবে কিংবা তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত থেকে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। আধুনিক ব্যবহারতত্ত্ববিদগণ বলেন ঐক্যমত্যের (consensual) বা নির্দেশমূলক (directive) পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিরোধের পক্ষগণ কোন বিবাদ মীমাংসায় উপনীত হলে তা অউজ নামে অভিহিত হবে (The Daily star, April 29, 2007)।

আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রায় প্রত্যেক দেশেই অনানুষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থা বিদ্যমান আছে এবং ঐ সকল অনানুষ্ঠানিক বিচার প্রতিষ্ঠান বিনা খরচে বা স্বল্প খরচে পক্ষদের মধ্যে বেশিরভাগ ছোট খাট বিরোধ এবং কিছু সংখ্যক বড় এবং জটিল বিরোধের দ্রুত মিমাংসা করে থাকেন। সাধারণত অনানুষ্ঠানিক বিচার করেন কোন এলাকার পেশার বা ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বা পক্ষগণের বা আদালতের নিযুক্ত সালিশ । আমাদের দেশে দেওয়ানি বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য ১৯৪০ সনের সালিশি আইনে পক্ষদের চুক্তির মাধ্যমে সালিশ নিযুক্ত করার বিধান আছে এবং পক্ষদের নিযুক্ত সালিশ তাদের দেওয়ানি বিরোধ নিস্পত্তি করে রোয়েদাত দিতে পারেন। সালিশি বিচার আদালতের মতো ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ নয়। সাধারণত ব্যবসায়ীগণ আদালতে মামলা

মোকদ্দমার ঝামেলা পরিহার করার জন্য সম্পাদিত ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে তাদের ব্যবসাসংক্রান্ত বিরোধ আপোসে নিষ্পত্তি করার জন্যে সালিশ নিযুক্ত করার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। ঐ আইনের বিধান মতে বিচারাধীন মামলায় ও পক্ষগণ সালিশ নিযুক্ত করে মামলার বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তি করার জন্যে আদালতে প্রার্থনা করলে আদালত ঐ মামলার বিরোধীয় বিষয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করে রোয়েদাদ দেয়ার জন্য পক্ষদের নিযুক্ত সালিশের নিকট বিষয়টি পাঠাতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে আদালত স্বত: প্রণোদিত হয়ে তদ্রুপ সালিশ নিষ্পত্তির জন্যে আদেশ দিতে পারেন না। কোন মামলার জটিল বিরোধীয় বিষয় আাদলতের বাইরের কোনো বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সহজভাবে নিষ্পত্তিযোগ্য হলে বা যেসকল মামলা আদালতের বাইরে সহজে স্বল্প সময়ে নিষ্পত্তিযোগ্য যেসকল মামলা আপোসে নিষ্পত্তি করার জন্যে আদালত কর্তৃক উক্তরূপ উদ্যোগ নেয়ার এবং পক্ষদের প্রস্তাবিত সালিশদের মধ্য হতে সালিশ নিযুক্ত করার বিধান করা যেতে পারে। আদালতের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পক্ষগণ সালিশের নাম প্রস্তাব না করলে তখন আদালত কর্তৃক যেকোন ব্যক্তিকে সালিশ নিযুক্ত করার বিধান করা যেতে পারে। অর্থাৎ আদালত কর্তৃক তদ্রুপ মামলায় বাধ্যতামূলকভাবে সালিশ নিযুক্ত করে মামলা নিষ্পত্তি করার বিধান করা যেতে পারে। তাহলে আদালত ঐ সকল জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী মামলা সালিশে নিষ্পত্তি করার জন্যে আদেশ দিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন।

দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যেকার বিরোধ সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্যে স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আইনজীবী সমিতি কোন কোন এলাকায় প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। দেশের আইনজীবী সমিতিগুলি অনেক বিরোধী আপোসে নিষ্পত্তি

করার জন্যে প্রত্যেক আইনজীবী সমিতির কয়েকজন প্রধান আইনজীবীকে নিয়ে একটি সালিশি কমিটি গঠন করতে পারেন। ঐ সমিতির কোন সদস্যের নিকট তার কোন মক্কেল কোনো বিরোধীয় বিষয় মামলা না করে বা বিচারাধীন মামলার বিরোধীয় আপোসে নিস্পত্তি করে দেয়ার জন্যে পরামর্শ চাইলে বা যেকোন আইনজীবী তার কোন মক্কেলের তদ্রুপ বিষয় আপোসে নিস্পত্তি করা সঙ্গত মনে করলে প্রতিপক্ষ বা প্রতিপক্ষের আইনজীবীকে ঐ বিষয়ে আইনজীবী সমিতির সালিশী কমিটির দ্বারা আপোসে নিস্পত্তি করতে অনুরোধ জানাতে পারেন। উভয় পক্ষ মামলার ব্যয় পরিহার করে তদ্রুপ সালিশে সম্মত হলে উভয় পক্ষের আইনজীবীর সহায়তায় ঐ সালিশী কমিটির সদস্য বা সদস্যদের দ্বারা তাদের বিবাদে নিস্পত্তি করাতে পারেন। এ ব্যবস্থায় পক্ষদের আইনজীবী ও সালিশকারী আইনজীবীকে তাদের কাজের জন্যে নির্দিষ্ট হারে ফিস দিলেও পক্ষগণ অল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে তাদের বিরোধ নিস্পত্তি করতে পারবেন।

বিচারাধীন মামলা সালিশে নিস্পত্তি করতে হলে আদালতের আদেশ প্রয়োজন হবে এবং উভয় পক্ষ তদ্রুপ আবেদন না করলেও সালিশ আইন উপরোক্ত মতে সংশোধন করে আদালতকে সালিশ নিযুক্ত করার ক্ষমতা দিলে আদালত তদ্রুপ আদেশ দিতে পারেন। বিচারাধীন বিষয় ছাড়া অন্য বিরোধী তদ্রুপ সালিসী কমিটি নিস্পত্তি করলে সালিসের রোয়েদাদ আদালতে দাখিল করে তা উভয় পক্ষের উপর বাধ্যকর ডিক্রিতে রূপান্তরিত করা যাবে।

ভারতে আইনগত সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা লোক আদালত গঠন করে আদালতে দীর্ঘস্থায়ী পারিবারিক বিরোধ, বীমার দাবি, বাণিজ্যি বিরোধ ইত্যাদি সংক্রান্ত বহুমামলা আপোসে দ্রুত নিষ্পত্তি করেছেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও একজন গণ্যমান্য নাগরিককে নিয়ে এক এলাকার জন্যে এক একটি লোক আদালত গঠন করে দীর্ঘস্থায়ী মামলাগুলি আপোসে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। লোক আদালত যেদিন যে এলাকার সে স্থানে অধিবেশনে বসেন তার পূর্ব থেকেই ঐ এলাকার নির্দিষ্ট আদালতের দীর্ঘস্থায়ী মামলার নথিগুলি ঐ লোকে আদালতে এনে আইনগত সহায়তা সেবা সংস্থায়, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আইনজ্ঞ ও আইন ছাত্রছাত্রীদের সহায়তায় ঐ সকল মামলার সার-সংক্ষেপ তৈরি করে মামলার পক্ষদের নোটিশ দিয়ে লোক আদালতে হাজির করে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের বিরোধ আপোসে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করেন। যেসকল মামলা এভাবে আপোসে নিষ্পত্তি হয় ঐ মামলাগুলিতে উভয় পক্ষের মধ্যে আপোস নিষ্পত্তির শর্তাবলী যুক্ত একটি চুক্তিপত্র বা সোলেনামা লেখা হয়। লোক আদালতের বিচারপতিগণ যে দিন অধিবেশনে বসেন সেদিন উভয় পক্ষ বিচারপতিদের সামনে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। ঐ সকল চুক্তিপত্র সহ যে আদালত থেকে মামলার নথিগুলি লোক আদালতে আনা হয়েছিল ঐ আদালতে মামলার নথিগুলি পাঠিয়ে দেয়া হয়। তখন ঐ আদালত ঐ চুক্তিপত্র বা সোলেনামার শর্তানুসারে মামলাগুলি নিষ্পত্তির আদেশ দিয়ে থাকেন। এ পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তিতে স্বেচ্ছাসেবীদের প্রচেষ্টা ও পক্ষদের সদিচ্ছা না থাকলে তা সফল হয় না। এ জন্যে লোক আদালত প্রক্রিয়ায়ও অনেক দীর্ঘস্থায়ী মামলা নিষ্পত্তি করা যায়না। তবে লোক আদালত প্রক্রিয়াকে আইনগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি নামে কিছুদিন আগে লোকসভায় একটি আইন

পাশ হয়ে তা ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এদেশে আবহমান কাল থেকে প্রচলিত গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ছোটখাট বিরোধ নিস্পত্তির যে প্রথা ছিল ব্রিটিশ শাসনকালে গ্রাম পঞ্চায়েত বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এখনো দেশের বেশিরভাগ ছোট খাট বিরোধ নিস্পত্তি করেন স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিগণ। তবে পূর্বে যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের সিদ্ধান্ত কেউ অমান্য করলে তাকে একঘরে করে শাস্তি দিতে পারতেন এবং ঐ শাস্তির ভয়ে তাদের সিদ্ধান্ত মানতে পক্ষদের বাধ্য করতে পারতেন তখন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাদের সিদ্ধান্ত মান্য করতে পক্ষদের বাধ্য করতে পারেন না। এর ফলে অনেক সময় স্থানীয়ভাবে নিস্পত্তিকৃত বিরোধ ও আদালতে পুনরায় দায়ের করা হয়। সাধারণত স্থানীয় টাউটগণ পক্ষদের মামলা মোকদ্দমায় জড়িত করে লাভবান হওয়ার কুমতলবে স্থানীয়ভাবে নিস্পত্তিকৃত বিষয় নিয়ে ও আদালতের দ্বারস্থ হতে পক্ষদের ইন্ধন যোগায়। এর ফলে অনেক গরিব ও স্বল্পবিত্ত লোক দীর্ঘস্থায়ী মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। এজন্য আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি বিনা খরচে বা অল্প খরচে দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য অনানুষ্ঠানিক বিকল্প বিচার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এজন্যে সালিশ আইন সংশোধন করে গ্রামীন সালিশের সিদ্ধান্ত পক্ষদের উপর বাধ্য করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে (হক, ১৯৯৭: ৩১৪)।

বাংলাদেশের বর্তমান বিচারব্যবস্থা দেশের দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগণের জন্য মোটেই অনুকূল নয়। যদিও এই বিচারব্যবস্থা সনাতনী ইংরেজ কমন ল (অলিখিত আইন) এর মডেল থেকে গৃহীত, এই ব্যবস্থা বাংলাদেশের যৌথ সমাজের মূল্যবোধকে উপেক্ষা করেছে এবং কৃষি নির্ভরশীল সংখ্যাগরিষ্ট দরিদ্রকৃত মানুষের আর্থসামাজিক দুরাবস্থার প্রতি ন্যায্য

সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তদুপরি এই বিচারব্যবস্থা দরিদ্রদের জন্য প্রতিকার প্রাপ্তিতে প্রতিকূল ও ব্যয়বহুল হওয়ায় তারা কদাচিত স্বেচ্ছায় এর দারস্থ হয় (আখতারুজ্জামান, ২০১৩: ৩২)।

৪. খ. বিকল্প পন্থার উৎস

বর্তমানে দেওয়ানি বিচারব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি করা হয়ে থাকে আদালতের সংশ্লিষ্ট বিচারক বা আদালতের বাইরে স্বীকৃত কোনো তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে এর সুফলও জনগণ পাচ্ছে। আমাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায়ও এর অস্তিত্ব আছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩, ৪, ৫-এ অপরাধের আপোসযোগ্যতা সংক্রান্ত বিধানগুলো বিধৃত রয়েছ। বার বিধি এবং অউজ (Twelve Tables and æADR") পশ্চিমা আইনবিদগণ æADR" এর বিকাশ সম্মন্ধে বলেন, æIt is the idea of our times"। বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা এক দিনে এবং একদেশে বিকশিত হয়নি। এটা বিভিন্ন যুগে মানুষের প্রয়োজনে বিভিন্ন আঙ্গিকে উন্মেষিত হয়েছে। অউজ ব্যবস্থা সর্বপ্রথম কোথায় এবং কিভাবে বিকশিত হয় তা নিয়ে আইনবিদদের মতে মতভেদ রয়েছে। তবে খৃষ্টপূর্ব ৪৫০ সনে গৃহীত রোমানদের বার বিধিতে (Twelve tables) বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থার উপস্থিতি লক্ষ করা যায় (আখতারুজ্জামান, ২০১৩: ২৪)।

Coercion দৃড়তার সাথে উল্লেখ করেছেন যে, কোট-কাচারিভুক্ত আইন কখনোই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মেটাতে পারে না।

æThese are based on the strong belief that laws are not the appropriate way to regulate daily life and hence should only play a secondary role.....”
(ড. মিজানুর রহমান æAlternative Dispute Resolution” Human Rights Summer School Manual, September, ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৪৮)।

প্রাচীনকালে চীনারা Win Win তত্ত্বে বিশ্বাস করে। মোকদ্দমার সাধারণ পথ পরিহার করে বিকল্পভাবে বিরোধ নিষ্পত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এ থেকেই বর্তমান আইনবেত্তাগণ নিজ নিজ আইন ব্যবস্থায় æADR” ব্যবস্থা প্রচলনে ক্রমেই আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

অনেক বিজ্ঞলোকের ধারনা যে, ADR is evolving as an æalternative to the legal system. ADR mechanism does not replace the Court System; rather strengthens and ‘further legitimates the formal judicial system’ (Anleu 2000, p. 131).

বিচারকার্য পরিচালনা কারার পদ্ধতি ছিল রোমানদের একধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এক্ষেত্রে রোমানরা বিবাদের কারণ সম্বলিত প্রশ্নগুলো বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা বা প্রেটরের নিকট প্রেরণ করতেন এবং তাঁর সম্মুখে বিবাদের প্রাথমিক মীমাংসা করা হতো। অতঃপর বিষয়টিকে একজন জজ বা সালিসকারী বা জজদের নিয়ে গঠিত বোর্ড বা জজদের স্থায়ী কলেজে প্রেরণ করা হতো। বারবিধি চুক্তি হতে উদ্ভুত বিরোধ (Stipulation) এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির বিভক্তির ক্ষেত্রে বিচারকগণ তাঁদের ব্যক্তিগত বিচার

বিবেচনা প্রয়োগ করে বিবাদ মীমাংসা করতেন। বিচারকগণ অনির্ধারিত অর্থ-দাবীর ক্ষেত্রে ও অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। এ প্রসঙ্গে R. W. League বলেন, æThe process may well mark the first introduction of arbitration as distinct from strict Judging in Roman law" রোমানরাই সর্বপ্রথম সালিসের মাধ্যমে অর্থাৎ বিকল্পভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া বিচারব্যবস্থায় প্রবর্তন করেন। চীনে বিকশিত Confucianism কে æADR" এর দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রাচীন চীনারা ঐ মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ বিকল্পভাবে নিষ্পত্তি শুরু করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান তাঁর রচিত æAlternative Dispute Resolution" প্রবন্ধে এই ব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, æThe philosophy of confucius was, in essence, one of harmony, of peace and of compromise resulting in a combination. The confucian view is that the best way of resolving a disagreement is by moral persuosion and compromise instead of by sovercign" (Rahman, September 2007, p. 148).

সংজ্ঞা ঃ বিচারের বানীকে আর নীরবে নিভৃতে কাঁদতে দেয়া যায়না। অসহায় বিচার প্রার্থীদের আর অসহায়ত্বের শিকার হতে দেয়া যায় না। তাদের আদালতের বারান্দায় বছরের পর বছর যুগের পর যুগ অপেক্ষা করতে দেয়া যায় না। তাদেরকে স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে বিচারের সুফল পৌঁছিয়ে দেয়া আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব

(Akhtaruzzaman, 2013: 2)। এতে করে আদালতের উপর একদিকে যেমন চাপ কমবে, অন্যদিকে বিচারপ্রার্থী জনগণ দ্রুত বিচার পাবে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিচার ব্যবস্থা, দুর্বল আদালত ব্যবস্থাপনা, লোক বলের স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে বিচারপ্রার্থী জনগণকে প্রতিনিয়ত আদালতে এসে হিমসিম খেতে হয়। বিচার বিলম্বের কারণে বিচার অবিচারের সামিল হয়। বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা আমাদের বিচারব্যবস্থার অন্যতম প্রধান অন্তরায় (পৃ. ১)।

আমাদের দেশে প্রচলিত বিচার পদ্ধতি মূলত Adversarial বিদ্যমান বিচার প্রক্রিয়ায় আনুষ্ঠানিক ও প্রথাগত পদ্ধতি সর্বস্ব বিচার পাওয়া যায়, মামলার পিছনে মানবিক, পারিবারিক, আর্থিক, মানসিক সকল বিবেচনা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। দেওয়ানী কার্যবিধি সাক্ষ আইন কোন কিছুই শেখানো সাক্ষী, মিথ্যা সাক্ষী ও হয়রানিমূলক মামলা বন্ধ করতে পারে না। অনেক সময় মিথ্যা ও শেখানো সাক্ষীর উপরেই আদালত রায় দিতে বাধ্য হয়।[১] সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়না। জয় পরাজয় ছাড়া অন্য কোন মীমাংসা এই পদ্ধতিতে হয়না। বংশানুক্রমিকভাবে এই ব্যবস্থা চিরন্তন শত্রুতা ও নিরন্তর মামলার জন্ম দেয়। প্রচলিত বিচারব্যবস্থার পরিবর্তে পক্ষগণের মধ্যে আপোষ মীমাংসার সনাতন পদ্ধতিই æADR" রূপে পরিচিত। æADR" এর মাধ্যমে দ্রুততার সাথে মামলার শুরুতেই উহা নিষ্পত্তি করে এবং প্রচলিত বিচার প্রক্রিয়ার কুফলগুলো এড়িয়ে পক্ষগণ ব্যক্তিগতভাবে কিংবা তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত থেকে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকেন।

Alternative Dispute Resolution (ADR) অর্থ বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা ঃ

প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তে পক্ষগণের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার সনাতন পদ্ধতিই ADR রূপে পরিচিত।

Alternative: The formal court system ADR involves non adversarila attitudes from the parties when they communicate with each other to find solutions. ADR provieds parties with an opportunity to effectively control the content of their dispute.

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে অথবা মধ্যস্থতা ও সালিশীর মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করার নামই ডিসপুট। Dispute: Dispute between parties may arise regarding the differences in their opinions on their rights and responsibilities to each other or to certain events, such differences may arise when two or more people are in disagreement regarding thier interests, value or relationship between them (stintzing 1994).

শান্তিপূর্ণ মীমাংসার লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনা, সৎ সেবা, মধ্যস্থা, অনুসন্ধান ও আপোষের প্রচেষ্টাই হচ্ছে ADR এর মূল লক্ষ্য। Resolution: ADR focuses on the resolution of disputes where both parties agree to settle their disputes with some mutually agreed terms (stintzing 1994). The trial system arranges a

settlement of a dispute following some standard rule of law, binding upon both the parties.

জাতিসংঘ সনদে আন্তর্জাতিক বিরোধ মিটানোর আপোষ পদ্ধতি বর্ণিত আছে। উক্ত সনদে বলা হয়েছে, "সব সদস্য রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যকার আন্তর্জাতিক বিরোধসমূহ শান্তিপূর্ণ উপায়ে এমনভাবে আপোষ নিষ্পত্তি করবে যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ন্যায় বিচার বিপন্ন না হয়। জাতিসংঘ সনদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তৃতীয় পক্ষের পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে, তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ও সালিসীর মাধ্যমে মধ্যস্থতার মাধ্যমে ও আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। আমাদের দেশে তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সমস্যাদি গ্রামের মাতব্বরগণ অনাদিকাল থেকে মীমাংসা করে আসছেন। পরবর্তীতে সালিসী কাউন্সিল বা গ্রাম আদালত ছোট খাট সমস্যাগুলো অনায়াসে সমাধা করে চলছে। তাছাড়া দেওয়ানী কার্যবিধি, সালিস আইন, অর্থঋণ আদালত আইন, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, দেউলিয়া বিষয়ক আইন ইত্যাদিতে বিরোধী নিষ্পত্তির বিকল্পব্যবস্থা থাকায় তদানুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ADR বলতে বুঝায় æA Process of dispute scttlement outside the formal Judicial system where the parties represent themselves personally or through their represent and try to resolve the dispute through a process of mutual compromise" (The Daily Star, April 29, 2007).

বিচারপতি মোস্তফা কামাল এর মতে, It is a non-formal sctllement of legal and Judicial disputes as a means of disposing of cases quickly and expensively,"[12] তাঁর মতে, æADR" is not a panacea for all evils but an alternative route to a more speedy and less expensive mode of settlement of disputes. It is a voluntary and cooperative way out of the impasses (বিচারপতি মোস্তফা কামাল কর্তৃক রচিত অপ্রকাশিত প্রশিক্ষণ উপকরণ থেকে উদ্ধৃত) ।.

৪. গ. ADR-এর বিভিন্ন ধরন

Arbitration বা সালিশ ঃ সালিশ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে 'মধ্যস্থ' । মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তিই হচ্ছে সালিসের মূল উদ্দেশ্য । United stcel workers Vs. warrior and Gulf Nav Co (1998) মোকদ্দমায় বিচারপতি ডগলাস Arbitration কে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে মন্তব্য করেন ঃ

It is a means of solving the unforeseeable by molding a system of private law for all the problems which may arise and to provide for their solution in a way which will generally accord with the variant needs and desires of the parties (আখতারুজ্জামান, বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির ধারণা ও আইন এবং আইনগত সহায়তা প্রদান, পৃ. ৮২) ।

Professor D. M. Walker-এর মতে æArbitration is a process of adjudication of a dispute or controversy on fact or law or both outside the ordinary civil courts, by one or more persons to whom the parties who are at issue refer the matter for decision" (Golam Mahbub, Alternative Dispute Resolution in Commercial Disputes, p. 21).

Arbitration-এর সংজ্ঞা দিতে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট বর্ণনা করেন ঃ

æArbitration is an arrangement for taking and abiding by the Judgment of selected persons in some disputed matters instead of carrying it to the established tribunals of Justice, and is intended to avoid the formalities the delay, the expense and vexation of ordinary litigation (Mahbub, p. 21).

সহজভাবে বলতে গেলে

Arbitration or সালিশ হচ্ছে ঃ

ক) একটি সহযোগিতামূলক সার্থ-নির্ভর সমঝোতা প্রক্রিয়া যা একটি নিরপেক্ষ তৃতীয় দল উভয় পক্ষের নিকট সন্তোষজনক কোন সমস্যা পারস্পারিকভাবে মীমাংসার লক্ষ্যে পরিচালনা করেন।

খ) যখন বিবাদরত পক্ষেরা তাদের জন্য সকল সিদ্ধান্ত তারাই গ্রহণ করে। পক্ষদের চাহিদা ও স্বার্থ যাচাইকরণে সাহায্য করে এবং পক্ষদের প্রয়োজন মাফিক বহুমাত্রিক বিকল্প খুঁজে বেড়ায়। সালিসকার পক্ষদের উপদেশ প্রদান করে না বা তাদেরকে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়না।

গ) যখন পক্ষেরা বিরোধ নিরসন প্রক্রিয়া তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং তাদের কথা তারাই বলে। কোন কোন সময় পক্ষেরা নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদেরকে সহায়তা করার জন্য সালিশকারের উপদেশমূলক পরামর্শ নিয়ে থাকে।

ঘ) যখন পক্ষদের গোপনীয়তা, তথ্যের প্রকাশ কোন সমঝোতা চুক্তির পরিণাম এমন সবের কার্যক্রম বিধিসমূহ কোন ঘটনার ভিত্তির উপর তৈরি করা হয় এবং তা সকল পক্ষের চাহিদা মিটাতে লাগসই করা হয়। সালিশকার প্রায়শ সাধাসিধে চুক্তি খসড়া বিবেচনার নিমিত্তে উপস্থাপন করেন।

ঙ) যখন পক্ষেরা মীমাংসার বিকল্পসমূহ পুংখানুপুংখরূপে খুঁজে একটি চুক্তিতে উপনীত হয়, যাতে সকলের প্রয়োজন ও স্বার্থ হাসিল হয়।

চ) যখন সালিশকার বর্তমান ঘিরেই আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য কীভাবে সর্বোত্তম পরিকল্পনা করা যায়, তাও আলোচনায় প্রাধান্য দেন। সালিশকার তার আলোচনায় পক্ষদের আত্মীয়তাসূত্র ও পরস্পর বন্ধন সূত্রের ওপরও আলোকপাত করেন।

প্রাচীন ভারত হইতেই এদেশে সালিশ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। অতীতে বিভিন্ন শ্রেণি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক ট্রাইব্যুনাল বা স্থানীয় সালিস বোর্ডের প্রচলন ছিল। পক্ষদের প্রতিনিধির সমন্বয়ে পারস্পারিক সম্মতির ভিত্তিতে বিরোধ মিমাংসা করিত। বর্তমানেও বিভিন্ন অনগ্রসর বা শ্রেণির মধ্যে সালিশ ব্যাবস্থার প্রচলন আছে।

পক্ষদের পছন্দের লোকদের দ্বারা বিরোধ নিস্পত্তির গুরুত্ব অপরিসীম। পদ্ধতিগত জটিলতা এড়াইয়া স্বল্প সময়ে, তড়িত গতিতে চূড়ান্তভাবে প্রতিকার লাভের উপায় হইতেছে "সালিশ আইন"। এই আইন শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক নিস্পত্তির ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইনের পূর্বে বাংলাদেশে ১৯৩৭ সনের সালিশ (প্রটোকল ও কনভেনশন ও ১৯৪০ সনের সালিশ) আইন দুইটি প্রচলিত ছিল। বর্তমান বিশ্ব সালিসীর মাধ্যমে বিচার মিমাংসার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছে। তাই আধুনিক বিশ্বের সহিত তাল মিলাইয়া ২০০১ সনে সালিশ রোয়েদাদ স্বীকৃত ও বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য সালিশ সম্পর্কিত বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত এই আইন। দীর্ঘদিনের ঝুলিয়া থাকা রাশি রাশি মামলা সহজে দ্রুততার সাথে নিস্পত্তি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৬১ সনে আপোষ আদালত (কনসিলেশন কোট) ও মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক গঠিত সালিসী পরিষদ, ১৯৭৬ সনে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ ও ১৯৮৫ সনে পারিবারিক আদালত সালিস আইনের উদ্দেশ্য পূরণ করে।

বারবিধি এবং æADR" (Twelve tables and 'ADR') পশ্চিমা আইনবিদগণ 'ADR' এর বিকাশ সম্বন্ধে বলেন, æIt is the idea of our times", æADR" ব্যবস্থা সর্ব প্রথম কোথায় এবং কিভাবে বিকশিত হয় তা নিয়ে আইনবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে খৃষ্টপূর্ব ৪৫০ সনে গৃহীত রোমানদের বার বিধিতে (Twelve Tables) বিরোধ নিস্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিচারকার্য পরিচালনা করার পদ্ধতি ছিল রোমানদের এক ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে রোমানরা বিবাদের কারণ সম্বলিত

প্রশ্নগুলো বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা বা প্রেটরের নিকট প্রেরণ করতেন এবং তাঁর সম্মুখে বিবাদের প্রাথমিক মীমাংসা করা হতো। অতঃপর বিষয়টিকে একজন জজ বা সালিসকারী বা জজদের নিয়ে গঠিত বোর্ড বা জজদের স্থায়ী কলেজে প্রেরণ করা হতো। বার বিধি অনুযায়ী চুক্তি হতে উদ্ভূত বিরোধ (Stipulation) এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বিভক্তির ক্ষেত্রে বিচারকগণ তাঁদের ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করে বিবাদ মীমাংসা করতেন। বিচারকগণ অনির্ধারিত অর্থ দাবীর ক্ষেত্রে ও অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। এ প্রসঙ্গে R.W. League বলেন æThe process may well... mark the first introduction of arbitration as distinct from strict Judging in Roman Law" [বই এর নাম]।

রোমানরাই সর্ব প্রথম সালিসের মাধ্যমে বিকল্পভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া বিচার ব্যবস্থায় প্রবর্তন করেন।

জিত-জিত সমাধান (Win Win Situation) ঃ দোষী বা নির্দোষী তা বিচারে আনা সালিশির উদ্দেশ্য নয়। বিরোধের সমস্যার মূলকোথায় এবং এ সমস্যা সমাধানের উপায় কী, এসব প্রশ্নে বিবাদরত পক্ষদের সাহায্য করাই হচ্ছে সালিশির দায়িত্ব। বিবাদরত পক্ষদ্বয়ের মধ্যকার সম্পর্ক একটি সমঝোতায় আনার লক্ষ্যে সালিশ সরাসরি কাজ করে। সাজা, প্রতিশোধ, কে দায়ী, পিছনে কী ঘটেছে এসব প্রশ্নের প্রতি নজর না দিয়ে একজন সালিসকার বিবাদমান পক্ষদের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে আলোকপাত করতে সাহায্য করেন। বিবাদমান পক্ষেরা তাদের এ্যাডভোকেটের জেরার আড়ালে আক্রমণকারী নয় বরং তারা

সাধারণ মানুষ যারা অহরহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কাজে একে অপরের মুখোমুখি হবে। সালিশকার বিবাদরত পক্ষদের মধ্যে বিরোধ দূরীকরণে সাহায্য করে। মূল শব্দগুলো "আপস মীমাংসা ও রফা" যদিও সকল ক্ষেত্রে সালিশের মীমাংসা নাও হতে পারে তথাপি সালিশি এমন একটি প্রচেষ্টা যা যে কোন সালিশকার হিসাবে কোর্টের মত পরিবেশ তৈরি করা তার কাজ নয়, যেখানে এক পক্ষ জিতে এবং অপর পক্ষের হার হয়। কিন্তু তার কাজ হচ্ছে বরং রফার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং পারস্পারিক বোঝাপড়ায় আসার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। সালিশি হচ্ছে একটি জিত জিত সমাধান যেখানে উভয় পক্ষ কিছু কিছু ছাড় দিয়ে ঐক্যমতে আসে।

মধ্যস্থতা (Arbitration) ঃ মধ্যস্থতা (Arbitration) একটি ব্যক্তিগত বিচার প্রক্রিয়া। একজন বিজ্ঞ তৃতীয় পক্ষ বিবাদরত উভয় পক্ষের আরজি শুনার পর কিছু বস্তুনির্ভর মানদণ্ড ও মাত্রার ভিত্তিতে আবশ্য পালনীয় রায় প্রদান করে। সিদ্ধান্ত তৈরির ক্ষমতা তৃতীয় পক্ষের ওপর ন্যস্ত থাকে, যদিও বিবাদরত পক্ষদের মধ্যস্থতার পরিধি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করার সুযোগ আছে এবং মধ্যস্থাতা কোর্ট ব্যবস্থার বাইরে ব্যক্তিগত বৈঠকে পরিচালিত হয়, তথাপি এই প্রক্রিয়া আইন প্রণয়ন ও কোর্ট পর্যালোচনার আওতায় আসে।

Negotiation (আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান)ঃ যে কোন বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রথম স্বাভাবিক ও প্রাচীনতম পন্থা হলো সংশ্লিষ্ট বিরোধভূক্ত পক্ষসমূহের মধ্যে সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান। তবে এর কার্যকারিতার প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে পক্ষসমূহের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার। আলোচনা বিরোধভূক্ত পক্ষসমূহের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি

করে, যা অনেক জটিল সংকট নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। যোগাযোগহীনতা, দূরীকরণ, কোন ভুল বুঝাবুঝির অবসান, বিরোধপূর্ণ বিষয়ের উপর একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি হৃদয়াঙ্গম এবং কোন সমঝোতায় পৌঁছার ক্ষেত্রে আলোচনার কোন বিকল্প নেই।

আলোচনা মৌখিকও হতে পারে, লিখিতও হতে পারে। অত্যাধুনিক রেডিও-ইলেকট্রনিক ও স্যাটেলাইট ব্যবস্থার মাধ্যমেও আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে। সম্মেলন আহ্বানের মাধ্যমেও কোন আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বহুপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠান একটি বহুল প্রচলিত রীতি এবং আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোন বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আলোচনা নিঃসন্দেহে একটি উৎকৃষ্ঠ পন্থা। আলোচনায় কাঙ্খিত ফল অর্জিত না হলে সব সময় এর কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে। আলোচনার ঘটনার উপর আলোক বর্ধিত হয়। বিরোধীয় পক্ষসমূহের অবস্থানে স্বচ্ছতা আসে। একে অপরের কাছে প্রাপ্য অধিকার পরিষ্কার হয়। ফলশ্রুতিতে যেকোন উপায়ে বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ সুগম হতে পারে।

৪. ঘ. বিভিন্ন দেশের অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা

ইসলাম এবং আপোষ মীমাংসা ঃ ইসলাম শান্তির ধর্ম। আপোষ মীমাংসায় ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য। আপোষ মীমাংসার প্রসঙ্গে কোরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ “যদি উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকাকর তবে তোমরা স্বামীর পরিবার হতে একজন ও স্ত্রীর

পরিবার হতে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে, যদি উভয়ে নিষ্পত্তি চায় তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।"[৩] একই বিষয়ে পবিত্র কোরআন শরীফের অন্যত্র বলা হয়েছে "মন্দের প্রতিফলন মন্দ, আর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ নিষ্পত্তি করে তার পুরষ্কার আল্লাহর কাছে। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[৪] পারিবারিক বিরোধ কিভাবে মীমাংসা করা যাবে সে বিষয়ে পবিত্র কোরআন শরীফে অন্যত্র উল্লেখ আছে "কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর কাছ থেকে দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষিত হওয়ার আশংকা করে; তবে তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাতে কোন দোষ নেই। আপোষ করা তো ভালো।"[৫]

প্রাচীন ভারতঃ আধুনিক যুগে বিরোধ নিষ্পত্তির এই ব্যবস্থা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও ভারতীয় উপমহাদেশে এ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয় প্রাচীনকালে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয়রা নিজ উদ্যোগে তাদের বিরোধ মিটমাটের জন্য ব্যক্তিগত সালিশদার বা Private Tribunals এর দারস্থ হতেন। রাজ উদ্যোগ বিচারব্যবস্থার প্রচলনের বহু আগেই প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যে বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রচলন ছিল। সে সময় কতিপয় ব্যক্তি, পরিষদের জন্ম নেয়। এরা হলো ঃ Kulas (কুলাস) (Faily or clan Assemblies), Srenis (শ্রী নিবাস) (Guids of men following the same occupation). Parishads (Assemblies of learned men who know law)-এ ধরনের আরও কতিপয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এদের কাজ ছিল পক্ষদের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধের মীমাংসা করে দেয়া এবং এগুলো কোন আদালত ছিল না। এ ক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তিতে গ্রামের বয়োজেষ্ঠ্য ব্যক্তি বা সুধীজনের সংগঠন বা এ ধরনের অন্য কোন

কর্তৃপক্ষ সহায়ক ভূমিকা পালন করতেন। ভারতীয় উপমহাদেশে এখন পর্যন্ত এরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থা প্রচলনের আগে এ উপমহাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে নয়া পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পারিবারিক বিরোধ, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বিরোধ, প্রতিবেশীর সাথে বিরোধ, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যকার বিরোধ ইত্যাদি ছোট খাটো বিরোধের নিষ্পত্তি উক্ত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করা হতো। এরপর ভারতবর্ষে লোক আদালতের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। লোক আদালতের অর্থ জনগণের আদালত বা People Court যা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত নয়। এটা এমন একটি ফোরাম যেখানে জনগণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তাদের বিরোধ মেটানোর জন্য আসে এবং আদালত জনগণকে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুপ্রেরণা জোগায় এবং পরবর্তীতে সালিসের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন। এই আদালত গ্রাম ও শহরের মানুষকে স্বল্প ব্যয়ে দ্রুততার সাথে বিচার উপহার দিয়ে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে গ্রাম আদালতে বিরোধ নিষ্পত্তির চেয়ে সালিশে নিষ্পত্তি হবার ব্যাপারটিই বেশী প্রাধান্য পায়। কেননা লিখিতভাবে অভিযোগ করার চেয়ে মৌখিকভাবে বিচার চাওয়া গ্রামীন জনসাধারনের কাছে অধিকতর সহজ বলে মৌখিক সালিশের সংখ্যা লিখিত সালিশের চেয়ে বেশী। দ্বন্দ্ব, বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সদস্যকে মৌখিকভাবে আবেদন জানিয়ে থাকে। এরকম মৌখিক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদের সদস্যরা প্রাথমিকভাবে নিজের ওয়ার্ডের সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে বিরোধ মীমাংসা করার চেষ্টা করে থাকেন সালিশের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে গ্রাম বা ওয়ার্ড পর্যায়ে সমস্যা সমাধান সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট ঘটনার বাদি বিবাদিকে গ্রাম আদালতে লিখিতভাবে আবেদন জানানোর পরামর্শ দিয়ে থকেন। এছাড়া

সরাসরি ও পরিষদে লিখিত অভিযোগ করা হয়ে থাকে। লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান চিঠি অনুযায়ী গ্রাম আদালত গঠন করেন এবং নির্দিষ্ট দিনে পরিষদে আদালতের সভা অনুষ্ঠিত হয়। [স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ১৯৯৭ এবং নারীর ক্ষমতায়ন ঃ চারটি ইউনিয়ন পরিষদের উপর একটি বিশ্লেষণ (১৯৯৭-২০০৩)]-গবেষক, আবেদা সুলতানা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮।

যে সকল মূলব্যক্তির গ্রামে আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক অবস্থান রয়েছে এবং গ্রামের সকল কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীন প্রেক্ষাপটে প্রাধান্য বিস্তার করে, তাদেরকেই এ গবেষণায় গ্রামীন এলিট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। Rahman গ্রামীন এলিটদেরকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন- আনুষ্ঠানিক/বৈধ, সনাতন এবং আধুনিক অর্থনৈতিক।[১৫] ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা (নির্বাচিত ও মনোনীত উভয়ই) হলো আনুষ্ঠানিক/বৈধ নেতৃত্ব।[১৬] "সর্দার" "প্রামাণিক" অথবা 'প্রধান' পরিবারগুলোর সদস্যরাই সনাতন নেতৃত্বে আসীন, যাদের কাজ শুধু অন্তঃ ও আন্তগ্রাম কলহ-বিবাদ মীমাংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ। গ্রাম উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও সংগঠনে যেসকল ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ও নেতৃত্ব দেয় তারাই আধুনিক অর্থনৈতিক নেতৃত্বে।[১৭] [গ্রামোন্নয়নে নেতৃত্বের ভূমিকা ঃ মেহের-পঞ্চগ্রাম নমুনা বিশ্লেষণ, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পৃ: ৩৯-৪১]।

পাঁচ ধরনের নেতৃত্ব ঃ

১। সনাতন নেতৃত্ব।

২। ইউনিয়ন পরিষদ বা ইউপি নেতৃত্ব।

৩। সালিশ নেতৃত্ব।

৪। ধর্মীয় নেতৃত্ব।

৫। সমবায় নেতৃত্ব।

সমবায় নেতৃত্ব ঃ সমবায় নেতৃত্ব বলতে আমরা গ্রামীন মাতব্বর শ্রেণিকে বোঝায়। এ ধরনের নেতৃত্বের মূল বৈশিষ্ট্য বংশমর্যাদা এবং নেতৃত্বের স্থানান্তর ও উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে ঘটে থাকে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলার গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের নেতৃত্বই দৈনন্দিন বিবাদ মীমাংসা থেকে শুরু করে এলাকার সকল ধরনের কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব প্রদান করে আসছেন মেহের, পঞ্চগ্রামে এধরনের দুটি মাতব্বর পরিবারকে চিহ্নিত করেছেন।

সালিশ নেতৃত্ব ঃ বাংলা অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক বিচার কাঠামোটি ব্রিটিশ আমলে তৈরি হয়েছে। এর পূর্বে সুলতানী বা মোঘল আমলে প্রচলিত কাজীর দরবারের আওতা ছিল সীমিত। বাংলার গ্রামাঞ্চলে যে অপ্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকে বিবাদ-মীমাংসা হয়ে আসছে তার নাম 'সালিশ'। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত বিবাদের সূচনা হয় স্বাভাবিকভাবেই। পরিবারের বা একটি গৃহস্থালীর মাঝে যেসকল বিবাদের উদ্ভব হয় তার মীমাংসা করেন পরিবার প্রধান। একই বাড়ির দু'পরিবারের বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব বাড়ি প্রধানের। বিবাদ বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে গেলে ক্রমান্বয়ে পাড়া প্রধান, গ্রাম প্রধান বা

গ্রামের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের এখতিয়ারে চলে যায়। এরপরও বিবাদ অমীমাংসিত থেকে গেলে প্রাতিষ্ঠানিক বিচার কাঠামোর দীর্ঘসূত্রিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক হয়রানির কারণে সাধারণত একান্ত প্রয়োজন বাদে জনসাধারণ থানা-পুলিশ তথা প্রাতিষ্ঠানিক বিচার কাঠামোর শরণাপন্ন হয় না। প্রবাদ আছে বাঘে ছুলে আঠারো ঘা পুলিশে ছুলে ছত্রিশ ঘা।

সনাতনভাবে গ্রামাঞ্চলে উত্তরাধিকর সূত্রে নির্বাচিত মাতব্বররাই সালিশ করতেন। কিন্তু ১৯৭৬ সালে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে সীমিত আকারে ফৌজদারি ও দেওয়ানি দুই ধরনের বিচার পরিচালনায় এখতিয়ার প্রদান করা হয়। সনাতন সালিশ নেতৃত্ব পরিবারের থেকেই অনেক ক্ষেত্রে ইউপি নেতৃত্ব এসেছে। এ ধরনের পরিবারের কতৃত্ব এখন পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়নি।

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্ব সালিশ পরিচালনা করে থাকেন। এর মধ্যে রয়েছে মাতব্বর, ইউপি, ধর্মীয়, সমবায় বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্ব।

ধর্মীয় নেতৃত্ব ঃ বাংলাদেশের প্রধান দুটি সম্প্রদায় মুসলমান ও হিন্দু। দুটি সম্প্রদায়েরই ধর্মীয় আসঞ্জন যথেষ্ট তীব্র। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রাত্যহিক ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পালনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ ছাড়া রমজান মাস, দুই ঈদ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী, শবে বরাত, মহররম ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জনসাধারণকে প্রতিনিয়ত মৌলবী-মাওলানাদের সাথে সংশ্রব রাখতে হয়। এছাড়া সুন্নতে খাতনা, আকিকা, বিয়ে, কুলখানি, চেহলাম প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও মাওলানাদের উপস্থিতি অপরিহার্য।

পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে দৈনন্দিন ধর্ম-কর্মের বাধ্যবাধকতা মুসলমানদের মত প্রবল না হলেও বারো মাসে তের পার্বনের জাতি বাঙ্গালী হিন্দু সারা বছরই বিভিন্ন দেব দেবীর পূজা করে থাকেন। এছাড়া বিয়ে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে পুরোহিত অপরিহার্য। আইনগতভাবে বিয়ের নিবন্ধনকরণ প্রধান হলেও উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

এছাড়া দৈনন্দিন জীবনাচরনেও ধর্মের বিপুল প্রভাব রয়েছে। বাল্য বিবাহ, পর্দা প্রথা, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে ধর্মীয় অনুশাসন মাওলানা বা পুরোহিতদের বক্তব্য প্রাধান্য পায় [পঞ্চগ্রামের নমুনা- পৃ. ১৮৬-১৯৩]।

আধুনিক ভারত ঃ বিরোধ নিস্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থাকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ভারতে Arbitration (Protocol and convention) Act, 1937 পাশ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫৮ সনে New York convention on the recognition and Enforcement of Foregn Arbitral Awards গ্রহণ করে যা পরবর্তী বছরের ৭ই জুন থেকে কার্যকর করা হয়। ১৯৫৮ সনের এ আইনের আঙ্গিকে ভারত Foreign Awards (Recognition and Enforcement) Act 1961 প্রণয়ন করে Arbitration সংক্রান্ত নানা আইন প্রণীত হলেও আদালতগুলোতে সালিশ পদ্ধতির নানা অনিয়মের কারণে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে। ফলে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট M/S Guru Nanak Foundation V. M/S Rattan Sing and sons মোকদ্দমায় বিরোধ নিস্পত্তির বিকল্প পন্থার উপর গুরুত্বারোপ করে মন্তব্য করেন ঃ

Interminable, time consuming complex and expensive court procedures impelled jurists to search for an alternative forum, less formal more effective and speedy for resolution of disputes avoiding procedural claptrap and this led them to Arbitration Act, 1940. However, the way in which the proceedings under the Act, are conducted and without an exception challenged in courts has made lawyers laugh and legal philosophers weep. ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের বর্ণিত observations গুলো গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করে ভারত সরকার Arbitration and conciliation Act, 1996 প্রণয়ন করে। এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা UNCITRAL Model Law এর অনুকরণে প্রনীত হয়েছে (The Contract Act, 1872, Section- 28)।

পাকিস্তান ঃ ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা অর্জনের পর পাকিস্তান আপোষ মীমাংসার ক্ষেত্রে ১৯৬১ সনে সর্ব প্রথম Conciliation Court ordinance জারী করে। ছোট খাটো দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিবাদ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে এ আদালত ব্যাপক পরিবর্তন আনে। এই অধ্যাদেশের বিধান গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। আদালতের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল বিবাদমান বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা। এ কারণেই ঐ আদালত Conciliation নামে পরিচিতি লাভ করে। এই আদালতের নিকট কোন বিরোধ উপস্থাপিত হলে বিরোধের পক্ষরা নিজ নিজ পক্ষে দুই জন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারতো। তন্মধ্যে এক জনকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য বা পৌরসভার ওয়ার্ড কমিশনার হতে হতো। ১৯৬৯-৭০ সনের Pakistan law Reforms Commission এর দাখিলী প্রতিবেদনে সালিশী আদালতের সফলতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয় ঃ In spite of all the objectians

mode aganinst the system of local tribunals, we find that the conciliation courts have been playing a useful role in setting disputes amiably. By and large, people are satisfied with the sense of participation the system given them and in principle the institution of conciliation court is not open to any serious objection: These courts have not only provided relief to the ordenary Courts but have also enabled the parties to get quicker and cheaper justice. The conciliation courts have also saved the people from unnecessary expenses because only a nominal fee is charged from the petitioner on the petition filed by him in a conciliation court The parties are also seved from the expenses of engaging a lawyer because the provisions of conciliation Court ordinance do not permit the appearane of legal practitioners in proceedings before a conciliation Court (Pakistan Law Reform Commission Report, 1970: 32)[১০]

পাকিস্তান Law Reforms Commission G H এ আরও উল্লেখ করা হয় যে, বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা যেমন Mediation, Arbitration compromise প্রথাগতভাবে প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত আছে। Conciliation Court বিরোধ নিষ্পত্তির ঐ ব্যবস্থাগুলোকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছে মর্মে রিপোর্টে বর্ণনা করা হয়। উক্ত আদালত বিরোধের কেবল আপোষ মীমাংসাই করতো না বরং যেক্ষেত্রে মীমাংসা ব্যর্থ হতো সেখানে স্বাভাবিক নিয়মে ঐ বিরোধের বিচার করতে পারতো।

বাংলাদেশ ঃ কমন ল' সিস্টেমের আওতাভুক্ত বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা প্রধানত Adversarial প্রকৃতির। ফলে দীর্ঘসূত্রিতা মামলার একটি অন্যতম সহায়ক শক্তি। এতে বিচারপ্রার্থী জনগণ একদিকে যেমন খরচান্ত হচ্ছে ঠিক তেমনি অন্যদিকে আইন আদালতের প্রতি প্রতিনিয়ত বিশ্বাস হারাচ্ছে। একটি দেওয়ানি মোকদ্দমা দায়ের হলে উহা কবে নাগাদ নিষ্পত্তি হবে তা অনিশ্চিত বিষয়ে পরিণত হয়। এ থেকে উত্তরণের জন্য তথা বাংলাদেশের আইন ও বিচারব্যবস্থাকে সহজবোধ্য স্বল্প, খরচায় ও স্বল্প সময়ে বিচার প্রাপ্তির উপায় খুঁজে বের করার জন্য বাংলাদেশের অন্যতম আইনবিজ্ঞানী বিচারপতি মোস্তফা কামাল ১৯৯৯ সনে গবেষণা কর্ম শুরু করেন। মোস্তফা কামালকে প্রধান করে Bangladesh Legal Study Group গঠন করা হয়। বাংলাদেশের তখনকার প্রধান বিচারপতি এই গ্রুপের অন্যান্য সদস্য ছিলেন তৎকালীন হাইকোর্ট বিভাগের জ্যৈষ্ঠ্য বিচারক বিচারপতি কে. এম. হাসান (যিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন), আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীণ যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) ও বর্তমানে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক বিচারপতি মোহাম্মদ আনোয়ারউল হক, আইন কমিশনের তৎকালীন সদস্য ও বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রফেসর ড. শাহ্ আলম এবং সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ। এই গ্রুপটি তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে বিলম্বের নানাবিধ কারণ উল্লেখ করে 'Mediation' এর মাধ্যমে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির বিষয় উল্লেখ করে দ্রুত একটি পাইলট প্রজেক্ট স্থাপনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। প্রাথমিকভাবে ঢাকায় অবস্থিত পারিবারিক আদালতগুলোতে এ ব্যবস্থা চালুর পক্ষে তাঁরা মত দেন। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে ১৯৮৫ সনের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের বিধানানুযায়ী

ভরণ-পোষণ, দেনমোহর, বিবাহ-বিচ্ছেদ, দাম্পত্য স্বত্ত্ব, পুনরুদ্ধার এবং নাবালকের শরীর ও সম্পত্তির অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলো বিচারের একচ্ছত্র অধিকার পারিবারিক আদালতের থাকায় তথা ঐ আইনেই আপোষ সূত্রে মোকদ্দমা নিস্পত্তির বিধান বিদ্যমান থাকায় এবং পারিবারিক আদালত সর্বনিম্ন আদালত হওয়ায় এখান থেকে প্রজেক্টের কাজ শুরু করা যা অন্য আদালতে 'Mediation' চালু করার ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণয়ন তথা দেওয়ানী কার্যবিধির সংশোধন প্রয়োজন হবে বলে ঐ গ্রুপ মত প্রকাশ করনে। ঢাকায় অবস্থিত পারিবারিক আদালতগুলোকে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে নেয়ার পর লক্ষ্য করা গেছে যে, পক্ষগণ কম খরচে দ্রুত তাদের বিরোধ নিস্পত্তি করতে পেরেছে মহিলারা অনায়াসেই তাদের মোহরানা ও খোরপোশর টাকা আদায় করতে পেরেছে, যা কিনা আগে ছিল তাদের জন্য এক প্রকার দু:স্বপ্নের বিষয়। এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে, পারিবারিক আদালতে মোহরানা ও খোরপোশের ডিক্রী পাওয়ার পর বাদিনী ডিক্রীদারকে পুনরায় ডিক্রী জারী মোকদ্দমা করতে হয়েছে। আবারও তাকে মোকদ্দমা দায়েরের খরচ, উকিলের খরচ, যাতায়াত খরচ ও আনুষঙ্গিক অনেক খরচ বহন করতে হয়েছে। এর পরও ডিক্রীকৃত টাকা আদায়ে ডিক্রীদারকে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কখনও কখনও ডিক্রীকৃত টাকা আদায়ের আগে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। অথচ æADR'' ব্যবস্থা চালুর ফলে এবং এ বিষয়ে বিচারকগণ প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে মহিলারা আগের তুলনায় এখন অনায়াসে এবং স্বল্প খরচায় তাদের প্রাপ্য পেয়ে যাচ্ছেন। পারিবারিক আদালতগুলোতে 'ADR' ব্যবস্থার সাফল্য দেখে উল্লেখিত গ্রুপের অন্যতম সদস্য এবং বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কে. এম. হাসান ৩১ শে অক্টোবর ২০০২ ঢাকায় আয়োজিত এক সেমিনারে তাঁর উপস্থাপিত গবেষণা প্রবন্ধে বর্ণনা করেন ঃ

The Success of mediation in the Family court is not the end. We look forward tothe day when introduction of ADR mechanism in other wards, like commercial courts, will be achieved.

শ্রীলংকা ঃ বিরোধের আপোষ মীমাংসা প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। বিদ্যমান আপোষ-মীমাংসার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোকে একীভূত করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে The Conciliation Boards Act, 1958 পাশ করা হয়। কমিউনিটি পর্যায়ে ছোট খাটো বিরোধ শুরুতেই মীমাংসা করার বিধান ঐ আইনে বিদ্যমান থাকে। কতিপয় সমস্যা থাকার কারণে ১৯৭৭ সনে উহা বাতিল করে The Mediation (Boards Act, 1988) প্রণীত হয়। পক্ষদের আবেদনক্রমে কিংবা আদালত কর্তৃক প্রেরিত হলে æMediation Board" ছোট খাটো বিরোধ মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে থাকেন। স্থানীয় লোকদের নিয়ে ঐ বোর্ড গঠিত হয়।

জাপান ঃ স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে বিকল্পভাবে বিরোধ নিষ্পত্তিতে জাপানীদের অভিজ্ঞতাও বেশ পুরানো। ১৯২২ সন থেকে ভূমি এবং বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত বিরোধ সালিসীর (Conciliaton) মাধ্যমে জাপানীরা নিস্পত্তি করতে শুরু করে। এই পদ্ধতিতে তারা অতি অল্প সময়ে লক্ষ্য লক্ষ্য মামলা নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে সেখানে যেকোনো মামলা সালিসীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যায়। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সেখানে সালিসী কমিশন (Conciliation Commission) রয়েছে।

ইংল্যান্ড ঃ ষাটের দশকে ইংল্যান্ডে মামলা মোকদ্দমা অত্যন্ত ব্যয় বহুল, সময় সাপেক্ষ ও জটিল প্রকৃতির ছিল। বড় বড় কোম্পানীগুলো খরচা ও সময়ের বিষয়টি চিন্তা করে মোকদ্দমা এড়িয়ে চলার চিন্তা করতো। ব্যবসা-বাণিজ্য টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তারা মোকদ্দমার পরিবর্তে বিকল্পভাবে বিরোধ নিষ্পত্তিতে আগ্রহী ছিল। যদিও এতে তারা খুব বেশী লাভবান হতো না। সত্তরের দশকের শেষার্ধে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ ও সংস্কৃতি অনেক বেশী বাস্তবমুখী হয়ে পড়ে। কিন্তু মোকদ্দমার খরচা, দীর্ঘসূত্রিতা এবং মামলার কাংখিত ফল পেতে অনিশ্চয়তা মোকদ্দমার পক্ষদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। মামলা মোকদ্দমায় পড়ে অনেক কোম্পানী তাদের কারবার গুটিয়ে ফেলে ও এতে তারা অভাবনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। Karl J. Maclie সম্পাদিত æA hand book of Dispute Resolution" æADR" in Action গ্রন্থে George Applebey তাঁর রচিত æAlternative Dispute Resolution and Civil Justice system" আর্টিকেল এ ইংল্যান্ডে æADR" ব্যবস্থার উন্মেষের চমকপ্রদ বর্ণনা দেন। ১৯৮৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে Lord Chancellor Hailshan দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রে বিশেষত আদালতের এখতিয়ার, আদালত প্রশাসন, মোকদ্দমায় বিলম্ব হ্রাস, খরচা ও জটিলতা নিরসনের উপায় খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে কতিপয় সংস্কার প্রস্তাব পেশ করেন। এক্ষেত্রে তিনি পাঁচ ধরনের মোকদ্দমা বেছে নেন। যথা ঃ ব্যক্তিগত বিরোধ নিষ্পত্তির চেয়ে বিকল্পভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করাই উত্তম। এতে করে উভয় পক্ষের বিজয় হয়। সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয় এবং আদালতের উপর চাপ কম পড়ে। বিশিষ্ট আইনবিদ S. L. Khanna তাঁর রচিত Comperative Law গ্রন্থে ফ্রান্সে æADR" ব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, There is a general belief in France that before any case goes to any of

the regular courts for trial official assistant should be provided to the parties Concerned for the scttlement of disputes. This dignified procedure has a tremensdous effect of diminishing the number of cases and relieving the regular courts from the burden of a considor able number of minor cases.[১৫] কাজ করে থাকে সেগুলো হলো শিল্প বিরোধ কাউন্সিল বাণিজ্যিক ট্রাইব্যুনাল, সমতাকরণ ট্রাইব্যুনাল (Roatledge and Sweet and Maxwell (1991), London, p. 41)।

নরওয়ে ঃ বিরোধ নিষ্পত্তিতে নরওয়ে জিয়ানদের অভিজ্ঞতার খ্যাতি রয়েছে। পৌর এলাকায় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ১৯৫৭ সনে Conciliation council গঠন করা হয়। তবে মফস্বল এলাকাতেও (Personal injuries) বাণিজ্যিক বিরোধ (Commercial disputes) ঋণের টাকা আদায় (enforcement of bebt) বসত বাড়ি (housing) এবং ছোট খাটো দাবী (small clains) সংক্রান্ত বিষয়। সংস্কার প্রস্তাবটিতে Arbitration পদ্ধতি প্রচলনের পরামর্শ যাবে। ১৯৮০ এর দশকে লন্ডন শহরের নামী দামী এডভোকেটরা বাণিজ্যিক বিরোধ প্রচলিত আদালত ব্যবস্থার পরিবর্তে বিকল্পভাবে নিষ্পত্তির দিকে মনোনিবেশ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত æADR" ব্যবস্থা তাদেরকে উল্লেখযোগ্যভাবে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৯০ সনের নভেম্বর মাসে লন্ডনে Centre for Dispute Resolution (CEDR) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানকে অনুসরণ করে অনেক বেসরকারি তথা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান বিরোধ নিষ্পত্তিতে æADR" ব্যবস্থা প্রয়োগ করা শুরু করে।

ফ্রান্স ঃ ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থা 'Civil law' এর অন্তর্ভুক্ত। প্রশাসন ও বিচার বিভাগ আলাদা। ফ্রান্সের বিচারব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাধারণ আদালত কর্তৃক মামলা নিষ্পত্তির আগেই মামলার পক্ষগণ বিরোধ মিটিয়ে ফেলেন। এতে করে সেখানে মামলাজট থাকেন। আদালতের উপর চাপ কম থাকে। সাধারণ আদালত ছাড়াও সেখানে কতিপয় বিশেষ আদালত (Special Court) আছে যেগুলো সালিশের (Conciliation) মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির কাজে সদা নিয়োজিত। ফ্রান্সের জনগণ বিশ্বাস করেন যে, আদালতের মাধ্যমে মামলা অনুরূপ কাউন্সিল কার্যকর আছে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয় বলে এখানে উকিল নিয়োগের সুযোগ নেই। মধ্যস্থতাকারীর জন্য সামান্য ভাতা নির্ধারণ করা হয় (Khanna, S. L., Comparative Law, Allahabad: Central Law Book Agency, 1984)।

অধ্যায় ৫

আলোচিত ইউনিয়ন ঃ ডাসার

ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত মাদারীপুর জেলা। শিবচর, রাজৈর, কালকিনি উপজেলা নিয়ে মাদারীপুর জেলা অবস্থিত। কালকিনি উপজেলার ডাসার একটি ইউনিয়ন। কালকিনি ও গৌরনদী পাশা-পাশি উপজেলা। স্থল পথে ঢাকা থেকে পাটুরিয়া-আরিচা ফেরীঘাট পার

হয়ে রাজবাড়ী, গোয়ালন্দ ঘাট হয়ে দক্ষিনমুখী বরিশাল যাওয়ার পথেই মাদারীপুর জেলা। নিম্নে মাদারীপুর জেলা, কালকিনি উপজেলা, ডাসার ইউনিয়ন ও পার্শ্ববর্তী নবগ্রাম ইউনিয়নের মানচিত্র তুলে ধরা হলো।

৫. ক. ম্যাপ নং ১, ২, ৩ এবং ৪-এ যথাক্রমে মাদারিপুর জেলা, কালকিনি উপজেলা, ডাসার ইউনিয়ন এবং পাশ্ববর্তী নবগ্রাম ইউনিয়নের মানচিত্র দেখানো হয়েছে।

মাদারীপুর জেলার মানচিত্র

কালকিনি উপজেলার মানচিত্র

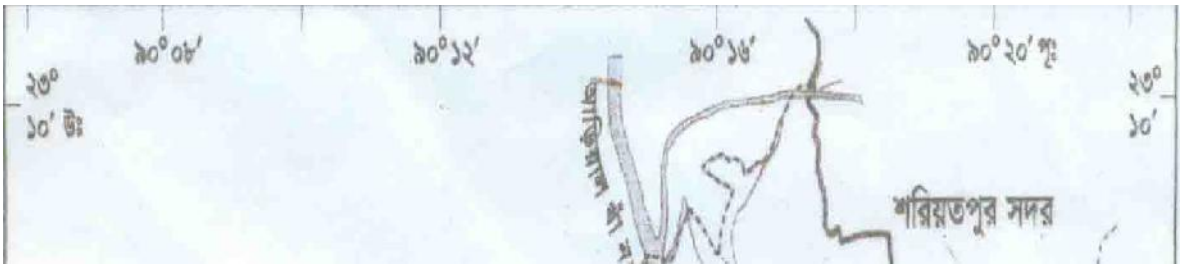

Dhaka University Institutional Repository

ডাসার ইউনিয়নের মানচিত্র

নবগ্রাম ইউনিয়নের মানচিত্র

৫. খ. আলোচিত ইউনিয়ন ঃ ডাসার

ভূমিকা ঃ

আমার গবেষণা এলাকা ডাসার। গবেষকের নিজস্ব এলাকা নবগ্রাম ইউনিয়ন সংলগ্ন ডাসার ইউনিয়ন। আমার দেখা মতে, এই ইউনিয়নে প্রায় সমান সমান হিন্দু মুসলমান ও কিছু অন্য সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। ছোটবেলায় ডাসার ইউনিয়নে কোন ভাল স্কুল-কলেজ ছিল না। তাই সেখানকার যারা বর্তমানে শিক্ষিত সম্প্রদায় তারা সবাই নবগ্রাম ইউনিয়নের শশিকর গ্রামের স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী। তার মধ্যে আমার বড় বোনদের বান্ধবীরা আমাদের বান্ধবী এবং বড় ভাইদের সাথে তাদের অনেক বন্ধুরাই আমাদের খুব কাছের। মজিদ চাচা প্রায়ই বাড়িতে এসে গল্প করতেন যুদ্ধের সময় তোমাদের সবাইকে নিয়ে বোরখা পরিয়ে নামাজ পড়িয়ে পাকিস্তানীদের হাত থেকে রক্ষা করেছি। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিটা তোমাদের সাথেই হত। সব মিলিয়ে ডাসার ইউনিয়ন সমস্ত সম্প্রদায়ের একটি মিলন মেলা।

ডাসার ইউনিয়ন ঃ মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার একটি ইউনিয়ন। শাহ্ আলী বোগদাদী ও হযরত শাহ বোরহান লাহোরী এ অঞ্চলে আগমন করেন। শাহ আলী বোগদাদীর পুত্র হযরত শাহ সৈয়দ ওসমান। তিনি এমন কামেল ছিলেন যে, যেকোন দায় বা বিপদাপদ তার কাছে এলে সেরে যেত। তাই লোকে দায় সারার জন্য তার কাছে ছুটে যেতেন। তাই এলাকাটির নাম হয়ে ওঠে দায়সার, যার অপভ্রংশ ডাসার। অনেকে মনে করেন, এখানে এক ধরনের বাঁশ পাওয়া যেত। এর নাম ছিল ডাসা বাঁশ। এ ডাসা

বাঁশ হতে এলাকাটির নাম হয় ডাসার। স্বাধীনতা পূর্ব ভারত বর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সুতিকাগার হিসেবে খ্যাত গোপালপুর ও ডাসার দ্বিতীয় চাঁটগা হিসেবে খ্যাত ছিল। উপমহাদেশের বিখ্যাত বিপ্লবীদের অনেকে আত্মগোপন কিংবা আত্মগোপনরত বিপ্লবীদের নিকট হতে দীক্ষা নেয়ার জন্য এখানে এসেছিলেন। মাস্টারদা সূর্যসেন, অধ্যাপক পুলিনকে, বাঘা যতীন, সুভাস বসু, সরোজিনি নাইডু ও জওহরলাল নেহেরুর মত নেতাগণ এখানে অবস্থান করেছেন বলে প্রবাদ আছে।

পদ্মা, মেঘনার মোহনা, কীর্তিনাশা ও আড়িয়াল খা এর কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা নদী দুলালী যেন প্রকৃতির এক অপূর্ব কেতন। অবস্থানগত কারণে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছাস ও মাটি ধ্বস ইত্যাদি এই ইউনিয়নের নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই অঞ্চলের মাটি পলি মিশ্রিত বলে প্রাকৃতিকভাবে উর্বর। অধিকাংশ জমি দুই ফসলি। অতি সহজে প্রচুর পরিমানে ধান ও অন্যান্য ফসল উৎপন্ন হয়। ভাটি এলাকা বলে অধিকাংশ চাষযোগ্য জমি বছরের ৫ মাস পানির নিচে থাকে। চতুর্দিকে ছড়িয়ে প্রচুর সবুজ বৃক্ষ। এখানকার নারিকেল দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় আকারে বড় ও সুস্বাদু। বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সহজলভ্যতা প্রাকৃতিক গর্ব। জনসংখ্যার ৮০ ভাগ কৃষি ও মৎসজীবী। কৃষি ও মৎস এই গ্রামগুলোর আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মূল বুনিয়াদ। প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও এখানে কোন শিল্প কারখানা নেই। এমনকি কুটির শিল্পও তেমন একটা চোখে পড়ে না। নদী ভাঙ্গন ও সম্পর্কের যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে না। এই গ্রামগুলোর অধিকাংশ লোক দরিদ্র। আর্থিক দীনতার কারণে ৪০% অভিভাবক সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর চেয়ে ক্ষেতে বা জাল নিয়ে নদীতে পাঠিয়ে দিতে

উৎসাহী। ডাসার ইউনিয়নের মোট ভূ-খণ্ডের পরিমান ৩,৯৬৬ একর। মোট ঘরের সংখ্যা ৩,১৪৮, মোট জনসংখ্যা ১৪,৪৭০।

ডাসার ইউনিয়ন সংলগ্ন পশ্চিম পাশে নবগ্রাম ইউনিয়ন। নবগ্রাম ইউনিয়নে ৪টি গ্রাম- শশিকর, নবগ্রাম, চলবল ও কালাইতলা। নবগ্রাম ইউনিয়নের পশ্চিম পাশেই কোটালিপাড়া থানার পীরের বাড়ি ও নৈয়ার বাড়ি গ্রাম। ডাসার ইউনিয়নের সাথেই দক্ষিনে খাইঞ্জাপুর ইউনিয়ন যেটি বরিশাল জেলার অন্তর্গত। ডাসার ইউনিয়নের পূর্ব পাশেই কাজী বাকাই ইউনিয়ন যেটি কালকিনি থানা এবং মাদারীপুর জেলার অন্তর্গত।

ভৌগলিক অবস্থান ঃ মাদারীপুর জেলার অন্তর্গত কালকিনি থানাধীন উত্তর প্রান্তে ডাসার ইউনিয়ন অবস্থিত। বর্তমানে ডাসার আর ইউনিয়ন নেই। সম্প্রতি ২০১৩ সালের ২রা মার্চ ডাসারকে নতুন থানায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ডাসারকে থানা করার জন্য তদন্ত কাজ শুরু হয়।

পূর্বতন ডাসার থানার মোট আয়তন ৩,৯৬৬ একর। স্থলপথে ঢাকা থেকে সরাসরি বরিশালগামী বাসে যাতায়াতকালে ভূরঘাটা নামক একটি বাস স্ট্যান্ড থেকে সোজা পশ্চিমে ছোট বাস অথবা স্কুটার, ভ্যান, রিকশাযোগে ডাসার থানায় পৌছানো যায়। ভূরঘাটা থেকে ১০ কিলোমিটার এগিয়ে সোজা পশ্চিমে যে রাস্তাটি চলে গিয়েছে তা পুনরায় গোপালগঞ্জ মহাসড়কে গিয়ে মিলিত হয়েছে। ডাসার থানাটি মূলত ভূরঘাটাগামী রাস্তার বাম পাশ এবং ডান পাশ দিয়ে অবস্থিত। ভূরঘাটাগামী রাস্তা সোজা পশ্চিমে

এগোতে থাকলে যেখানে ডাসার থানা শেষ হয়েছে তারপরেই কালকিনি থানাধীন নবগ্রাম ইউনিয়ন শুরু। পূর্বতন ডাসার ইউনিয়নে মোট ১৩টি গ্রাম রয়েছে। প্রতিটি গ্রামেই কয়েকটি করে পাড়া রয়েছে। কমলাপুর ডাসার ইউনিয়নের একটি বিখ্যাত গ্রাম। অতীতে এটি ছিল ব্যবসায়িক স্থান। হিন্দু দেবী লক্ষ্মির অপর নাম কমলা। সে সময় দেবী লক্ষ্মি স্থানীয়ভাবে কমলা নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। তার নামানুসারে স্থানটির নাম হয় কমলাপুর। তবে অনেকে মনে করেন, দনুজ মর্দনদের চতুর্থ অধ:স্তন ছিলেন জয়দেব, পিতা হরিবল্লভ। জয় দেবের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি মরে গেলে ত্বদীয় কন্যা কমলা দেবী কিছুদিন রাজ্য পরিচালনা করেন। কমলা ছিলেন অত্যন্ত প্রজাপ্রিয়। তার নামানুসারে এলাকাটির নামকরণ করা হয় কমলাপুর। আবার কেউ কেউ মনে করেন, কালকিনি অঞ্চলে অনেক বিল ছিল। ঐ সকল বিল কুমলাবন ও বেতালোহায় সমাকীর্ণ ছিল। গ্রামীণ গরিব গৃহস্থগণ বিল হতে কুমলাবন সংগ্রহ করে খড়ের ঘর নির্মাণ করত। ঐ কুমলাবন হতে কমলাপুর। আধুনিক গবেষণায় জানা যায়, পর্তুগিজরা কালকিনি অঞ্চলে কমলা চাষের প্রচলন করে। এখানে এক পর্তুগিজ স্থায়ী নিবাস করে বিশাল এক কমলা বাগান সৃজন করে। তাই এলাকাটির নাম হয় কমলাপুর। বাঁক শব্দ হতে বাকাই। নদীর বাঁকের গ্রাম। তাই নাম বাকাই। কাজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা হযরত শাহ বোরহান লাহোরি নদীর বাঁকে বসতি স্থাপন করার পর বাকাই নাম পায়। বেতবাড়ি নামে পরিচিত অঞ্চলটি বেতারোহা ও বেত এর জন্য বিখ্যাত ছিল। তাই নাম হয় বেত বাড়ি। অনেকে মনে করেন, এখানে এক সময় বেত দিয়ে বাড়ি তৈরী করা হতো তাই বেত বাড়ি। খিল শব্দের অর্থ চাষাবাদের অযোগ্য জমি বা চাষাবাদে আংশিকযোগ্য কিন্তু চাষ করা হয়না, এরূপ অপেক্ষাকৃত উচুঁ ভূমিকে বোঝায়। এরূপ

খিল ভূমিতে বসতি স্থাপন করায় নাম হয় খিলগ্রাম। খিলগ্রামের উত্তরাংশ উত্তর খিলগ্রাম এবং দক্ষিণাংশ দক্ষিণ খিলগ্রাম। অনেকে মনে করেন, আড়ুয়াকান্দি নামটি নাকি আড়াই কান্দি হতে সৃষ্ট। আড়াই কান্দি নিয়ে এটি গঠিত। তাই আড়াইকান্দি অপভ্রংশে আড়ু য়াকান্দি।

পরিবারের ধরণ ঃ ডাসার ইউনিয়নের মোট পরিবারের সংখ্যা ৩,১৪৮। পরিবারগুলি অপেক্ষাকৃত বড় এবং অধিকাংশই যৌথ পরিবার। এখানে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিছু কিছু মহিলা শিক্ষিতা উপার্জনক্ষম এবং পরিবার প্রধানের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হলেও পুরুষের উপর নির্ভরশীল। শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ পরিবার প্রধান পুরুষ।

ডাসার থানার অধিকাংশ লোক দরিদ্র। তবে চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করে এমন লোক নেই বললেই চলে। অল্প পরিশ্রমে দৈনিক খরচের আয় উপার্জন আসে বলে কাউকে উপোস থাকতে হয়না। তাই এরা প্রকৃতভাবে অলস ও সুখপ্রিয়। আর্থিক দীনতার কারণে ৪০% অভিভাবক সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর চেয়ে ক্ষেতে বা জাল নিয়ে খালে পাঠিয়ে দিতে উৎসাহী। তবে সৈয়দ আবুল হোসেনের শিক্ষাপ্রসার প্রচেষ্টা ডাসার থানায় শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধি করেছে। কারণ নারী শিক্ষায় এখনো ডাসার থানার অবস্থান অনেক পিছিয়ে। শিক্ষার নিম্নহারের কারণে বহুবিবাহ, যৌতুক প্রথা, অল্প বয়সে বিবাহ ও পারিবারিক বিপদ সামাজিক জীবনকে অক্টোপাসের মত আটকে রেখেছে। কুসংস্কার যেন ৮০ ভাগ ডাসার থানাবাসীর সংস্কৃতি। জিন, ভুত, প্রেত ও

ঝাড়ফুকের কবলে নিপতিত ডাসার থানাবাসীর গড় বয়স জাতীয় মাত্রার চেয়ে ৫ বছর কম। অথচ প্রাকৃতিক নির্মলতা ও প্রোটিন প্রাপ্তি সহজলভ্য উৎস বিবেচনায় গড় আয়ু জাতীয় হারের চেয়ে বেশী হওয়াই ছিল সংগত। ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে গোঁড়ামিও লক্ষ্যণীয়। তবে এ গোঁড়ামি অসাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করলেও নিজেদের আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত ব্যবস্থার প্রতি হুমকিস্বরূপ। ডাসার থানায় সরকারি প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ১২টি। মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ৪টি। কলেজের সংখ্যা ৫টি। মসজিদের সংখ্যা ৪২টি। বন্দরের সংখ্যা ১৫টি। ধামুসা, দর্শনা, কমলাপুর- ৩টি বাজার। বাসস্ট্যান্ড ২টি, পুকুর, খাল/নদী, ব্রীজ/সাকো ঃ পুকুর ২০০টি, খাল ৪টি, ব্রীজ/কালভার্ট/সাকো ঃ ২৩টি/২৫টি। মোট লোকসংখ্যা ১৪,৪৭০ জন। মোট ভোটার ১০,৫৭৯ জন। পুরুষ ভোটার ৫,২৫৯, মহিলা ৫,৩২০। আবাদী জমি ১,৩৭০ একর, অনাবাদী ২৭০ একর। গ্রাম ১৩টি, পরিবার ৩,১৪৮টি।

কৃষিগত অবস্থান ঃ ডাসার থানাধীন আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের বুনিয়াদ মূলত কমবেশি ৩০০ পরিবারের আয়ত্ত্বে। কৃষি, মৎস ও যানবাহন সেক্টরসহ আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রায় সবকিছু মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারে সীমাবদ্ধ। এই ৩০০ পরিবার ডাসার থানার মূল নিয়ন্ত্রক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রভাবক। বাকিরা তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইশারায় তাড়িত হয় বা হতে বাধ্য হয়। অধিবাসীরা মুসলিম ও হিন্দু রয়েছে। তবে এলাকায় কোন ধর্মীয় সহিংসতা বা সাম্প্রদায়িকতা নেই। বিগত ৫০ বছরে এখানে কোন ধর্মীয় হানাহানি হয়নি। প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এখানে কোন শিল্প কারখানা নেই। এমনকি কুটির শিল্পও তেমন একটা চোখে পড়ে না। অথচ অভ্যন্তরীণ প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের

নিজস্ব প্রয়োজনে মাঝারি আকারের শিল্প কারখানা পর্যাপ্ত লাভজনক বলে গবেষণায় দেখা যায়। নদীর ভাঙ্গন ও কষ্টকর যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে না। এই থানার বিভিন্ন লোক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প কারখানা গড়ে তুললেও এলাকার দিকে নজর দিচ্ছে না। যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এখানে শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে না।

এই থানার মাটি পলি মিশ্রিত বলে প্রাকৃতিকভাবে উর্বর এবং অধিকাংশ জমি দুই ফসলি। অতি সহজে প্রচুর পরিমাণ ধান ও অন্যান্য ফসল উৎপন্ন হয়। ভাটি এলাকা বলে অধিকাংশ চাষযোগ্য জমি বছরের ৫ মাস পানির নিচে থাকে। মাটি যেকোন ফসলের জন্য উপযুক্ত। চতুর্দিকে ছড়িয়ে প্রচুর সবুজ বৃক্ষ। প্রতিটি বৃক্ষ ঘন, সবুজ ও পুষ্ট। বিভিন্ন প্রজাতির গাছের সহজলভ্যতা প্রাকৃতির গর্ব।

স্যানিটেশন ঃ ডাসার এলাকার ০.২০ ভাগ লোক ট্যাপ, ৯১.৩৪ ভাগ লোক নলকূপ, ৪.৩২ ভাগ লোক গভীর নলকূপ ১.১৭ ভাগ লোক পুকুর এবং ২.৯৭ ভাগ লোক অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত জল পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করেন। ডাসার এলাকার ২৮.০০ ভাগ লোক বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করেন।

ডাসার ইউনিয়নের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ, ডাসার ইউনিয়নের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ এবং স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ আতাহার আলী কালকিনি উপজেলার ডাসার গ্রামে ১৯১৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিঁনি বিখ্যাত ইসলাম ধর্মপ্রচারক হযরত

সৈয়দ ওসমানের বংশধর। সৈয়দ আতাহার আলী বিভাগ পূর্বকালে বর্ধমান জেলায় সেটেলমেন্ট বিভাগে চাকুরি করতেন।

আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন এম,পি আলহাজ্ব সৈয়দ আতাহার আলীর দ্বিতীয় পুত্র। তিনি আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসেবে **১৯৯১, ১৯৯৬** ও **২০০১** সালের নির্বাচনে কালকিনি ও মাদারীপুর উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি **১৯৯৬** সালের **২৩** শে জুন আওয়ামী লীগ সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। গত **২০০৮** সালের নির্বাচনে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে পূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর পিতার নামে ডি. কে. আইডিয়াল সৈয়দ আতাহার আলী একাডেমি এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া তিনি খোয়াজপুর কলেজ, কালকিনি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ডাসার শেখ হাসিনা একাডেমি ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ তিনি **১৯৩৪** সালে কালকিনি থানায় মাইছপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট কবি ও ঔপন্যাসিক।

ক্যাপ্টেন আলমগীর সাত্তার বীর প্রতীক ঃ কাজী আব্দুস সাত্তার **১৯৩৯** সালের **২৭** শে জুলাই মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার গোপালপুর গ্রামে কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

রায়বাহাদুর রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঃ তিনি কালকিনি থানায় কাজী বাকাই ইউনিয়নের মাইজপাড়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারের কৃতি সন্তান। রজনীকান্ত ছিলেন কলকাতা প্রেসিডেন্সী জজকোর্টের সেশন জজ।

ডাঃ কাজী আবদুস সাত্তার ঃ ১৮৭৫ সালে কালকিনি উপজেলার গোপালপুর গ্রামে কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৯ সালের ১লা অক্টোবর কাজী আব্দুস সাত্তার College of physician and surgeons of India হতে medicine, surgery and midwifery পরীক্ষায় পাস করেন। তার জেষ্ঠকন্যা জোহরা কাজী ১৯৩৫ সালে এবং কনিষ্ঠ কন্যা শিরিন কাজী ১৯৩৮ এম. বি. বি. এস. পাস করেন। তারা বাঙালী মুসলমান মহিলাদের মধ্যে প্রথম ডাক্তার।

১৯৪৭ সাল হতে ১৯৭০ পূর্ব বাংলার মাদারীপুর পাকিস্তানের অধীনে ছিল। এ সময় ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনে অংশ নেয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে মাদারীপুর বীরত্বের পরিচয় দেয়। এ মহাকুমার আব্দুর রাজ্জাক, ফণী ভূষণ মজুমদার, মুজিবনগর সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী মাদারীপুরের হাজার হাজার লোককে হত্যা করে। স্বাধীনতার পর পুনর্গঠনের কাজ চলে।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে ডাসার ইউনিয়নের গ্রামগুলোর ঘর এবং জনসংখ্যার বিবরণ দেওয়া হলো ঃ

জনসংখ্যা							
সিরিঃ নং	গ্রাম	মোট ঘরের সংখ্যা	মোট	ঘরে বসবাসরত	ভাসমান	প্রতি বর্গ কি.মি.	জনসংখ্যার ঘনত্ব
১.	আলিসার	৩৩৭	১৫১৮	১৫১৮	০		ঘনত্ব
২.	আড়ুয়াকান্দি	৬৯	৩১৩	৩১৩	০		
৩.	বাকাই	২৮	১২৭	১২৭	০		
৪.	বেতবাড়ি	১২০	৭৪১	৭৪১	০		
৫.	দক্ষিণ খিলগ্রাম	১৯০	৭৪৮	৭৪৮	০		
৬.	ডাসার	৫১৭	২২০৮	২২০৮	০		
৭.	ধামুসা	২৬৬	১২৩১	১২৩১	০	৯০২	
৮.	ডোমরা	১২৮	৬১৫	৬১৫	০		
৯.	গোপালসেন	২৩	১০০	১০০	০		
১০.	জীনবারি	১	৬	৬	০		
১১.	পশ্চিম দর্শনা	১৪২	৬০১	৬০১	০		
১২.	পশ্চিম কমলাপুর	২২০	১১০৪	১১০৪	০		
১৩.	পূর্ব কমলাপুর	৪৯৫	২৩৯৩	২৩৯৩	০		

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো, ২০১১, তাং ৩ জানুয়ারী ২০১৩।

http://w.w.w.bbs.gov.bd/web. Test Application/userfiles/Image/census 20.

ছেলে এবং মেয়েদের সংখ্যা

সিরিয়াল নং	গ্রাম	মোট জনসংখ্যা	ছেলে	মেয়ে
১.	আইসার	১৫১৮	৭৫৬	৭৬২
২.	আড়ুয়াকান্দি	৩১৩	১৫৯	১৫৪
৩.	বাকাই	১২৭	৬৪	৬৩
৪.	বেতবাড়ি	৭৪১	৩১৪	৪২৭
৫.	দক্ষিণ খিল গ্রাম	৭৪৮	৩৪০	৪০৮
৬.	ডাসার	২২০৮	১০৫১	১১৫৭
৭.	ধামুসা	১২৩১	৬২৪	৬০৭
৮.	ডোমরা	৬১৫	৩০২	৩১৩
৯.	গোপালসেন	১০০	৫৯	৪১
১০.	জীনবারি	৬	২	৪
১১.	পশ্চিম দর্শনা	৬০১	৩২১	২৮০
১২.	পশ্চিম কমলাপুর	১১০৪	৫০৮	৫৯৬
১৩.	পূর্বকমলাপুর	২৩৯৩	১১৭৬	১২১৭
১৪.	পূর্ব নবগ্রাম	৩৪৮	১৬৫	১৮৩
১৫.	পূর্ব দর্শনা	১৬৩৪	৮১২	৮২২
১৬.	উত্তর খিলগ্রাম	৭৮৩	৩৯০	৩৯৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো, ডিসেম্বর ১১, ২০১১, তাং ৩ জানুয়ারী ২০১৩

http://w.w.w.bbs.gov.bd/web. Test Application/userfiles/Image/census 20.

বিভিন্ন সম্প্রদায় অনুযায়ী ভাগ

সিরিয়াল নং	গ্রাম	মোট জনসংখ্যা	মুসলিম	হিন্দু	খৃষ্টান	বুদ্ধিষ্ট	অন্যান্য
১.	আইসার	১৫১৮	৯৩৯	৫৭৯	০	০	০
২.	আড়ুয়াকান্দি	৩১৩	২৭	২৮৬	০	০	০
৩.	বাকাই	১২৭	১২৭	০	০	০	০
৪.	বেতবাড়ি	৭৪১	৬২৮	১০৭	৬	০	০
৫.	দক্ষিণ খিল গ্রাম	৭৪৮	৫২৮	২২০	০	০	০
৬.	ডাসার	২২০৮	২২০৮	-	০	০	০
৭.	ধামুসা	১২৩১	৪৯৪	৭৩৩	৪	০	০
৮.	ডোমরা	৬১৫	৪৯৩	২২	০	০	০
৯.	গোপালসেন	১০০	১০০	০	০	০	০
১০.	জীনবারি	৬	৬	০	০	০	০
১১.	পশ্চিম দর্শনা	৬০১	০	৬০১	০	০	০
১২.	পশ্চিম কমলাপুর	১১০৪	১০৯৭	৭	০	০	০
১৩.	পূর্বকমলাপুর	২৩৯৩	২২৪২	১৫১	০	০	০
১৪.	পূর্ব নবগ্রাম	৩৪৮	১৩	৩৩২	৩	০	০
১৫.	পূর্ব দর্শনা	১৬৩৪	৮২৫	৮০৭	২	০	০
১৬.	উত্তর খিলগ্রাম	৭৮৩	৪০৮	৩৭৫	০	০	০

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো, ২০১১, তাং ৩ জানুয়ারী ২০১৩।

http://w.w.w.bbs.gov.bd/web. Test Application/userfiles/Image/census 20.

পানি, বিদ্যুৎ, কৃষি, ইন্ডাস্ট্রিতে অংশগ্রহণ করার তালিকা

সিরিঃ নং	গ্রাম	ঘরের সংখ্যা	পানির ব্যবহার ট্যাপ/টিউবওয়েল		অন্যান্য	বিদ্যুৎ সংযোগ	ঘরের অবস্থান		
১.	আইসার	৩৩৭	০.০	৯৯.৪	০.৬	৬৮.৫	৯৯.৪	০.৩	০.৩
২.	আড়ুয়াকান্দি	৬৯	০.০	১০০.০	০.০	৬৯.৬	১০০.০	০.০	০.০
৩.	বাকাই	২৮	০.০	১০০.০	০.০	৩২.১	১০০.০	০.০	০.০
৪.	বেতবাড়ি	১০২	১.০	৯৯.০	০.০	৮৩.৩	৯১.২	১.০	৭.৮
৫.	দক্ষিণ খিল গ্রাম	১৯০	০.৫	৯৯.৫	০.০	৪৩.৭	৯৮.৯	০.০	১.১
৬.	ডাসার	৫১৬	০.০	৯৫.৭	৪.৩	৮০.৪	৯৯.০	১.০	০.০
৭.	ধামুসা	২৬৬	০.৮	৯৭.৭	১.৫	৩৭.২	৯৬.৬	১.৯	১.৫
৮.	ডোমরা	১২৮	০.০	১০০.০	০.০	৭৩.৪	১০০.০	০.০	০.০
৯.	গোপালসেন	২৩	০.০	১০০.০	০.০	০.০	১০০.০	০.০	০.০
১০.	জীনবারি	১	০.০	১০০.০	০.০	০.০	১০০.০	০.০	০.০
১১.	পশ্চিম দর্শনা	১৪২	০.০	৯৮.৬	১.৪	৯৭.২	১০০.০	০.০	০.০
১২.	পশ্চিম কমলাপুর	২২০	০.০	৯৯.৫	০.৫	৬৯.১	১০০.০	০.০	০.০
১৩.	পূর্বকমলাপুর	৪৯৪	০.০	১০০.০	০.০	৬২.৮	৯৯.৪	০.৪	০.২

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো, ২০১১, তাং ০৩ জানুয়ারী ২০১৩।

http://w.w.w.bbs.gov.bd/web. Test Application/userfiles/Image/census 20.

স্কুলে অংশগ্রহণকারী ছেলে-মেয়ের সংখ্যা

সিরিয়াল নং	গ্রাম	মোট স্কুলগামী	স্কুলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
			ছেলে	মেয়ে
১.	বেতবাড়ি	৭১	২৮	৪৩
২.	দক্ষিণ ক্ষিল গ্রাম	২১৮	৮৬	১৩২
৩.	ডাসার	৬৮৪	৩০২	৩৮২
৪.	ধামুসা	২৫৯	১০০	১৫৯
৫.	ডোমরা	২২১	৯৪	১২৭
৬.	গোপালসেন	৫০	২০	৩০
৭.	জীনবারি	০	০	০
৮.	পশ্চিম দর্শনা	২৩৩	১১২	১২১
৯.	পশ্চিম কমলাপুর	১৬৪	৬৭	৯৭
১০.	পূর্ব কমলাপুর	৬৪৬	২৪৬	৪০০
১১.	পূর্ব নবগ্রাম	১০০	৪৫	৫৫
১২.	পূর্ব দর্শনা	৬৫২	২৯৭	৩৫৫
১৩.	উত্তর ক্ষিলগ্রাম	২৮৪	১২৫	১৫৯

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো, ২০১১, তাং ০৩ জানুয়ারী ২০১৩।

http://w.w.w.bbs.gov.bd/web. Test Application/userfiles/Image/census 20.

বিভিন্ন পেশার তালিকা

সিরি: নং	গ্রাম	চাকুরিজীবি		কাজ খুজতেছে		ঘরের কাজ করে		কাজ করে না	
		ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
১.	বেতবাড়ি	১৬	২	০	০	০	২১	১২	২০
২.	দক্ষিণ ক্ষিলগ্রাম	৫৩	৪	১	০	০	৯৯	৩২	২৯
৩.	ডাসার	২৫০	১৬	৪	১	৩	৩০৮	৪৫	৫৭
৪.	ধামুসা	৭০	১১	০	০	২	১০৮	২৮	৪০
৫.	মোমরা	৮৬	২	০	০	২	১১৮	৬	৭
৬.	গোপালসেন	১৮	১	০	০	০	২৪	২	৫
৭.	জীনবারি	০	০	০	০	০	০	০	০
৮.	পশ্চিম দর্শনা	৮৭	২	০	২	২	৮৩	২৩	৩৪
৯.	পশ্চিম কমলাপুর	৫৯	২	০	০	১	৮৭	৭	৮
১০.	পূর্ব কমলাপুর	২৩৯	৬	৩	৪	১	৩১৭	৪৩	৭৩
১১.	পূর্ব নবগ্রাম	৩৬	০	০	০	২	৪৫	৭	১০
১২.	পূর্ব দর্শনা	২৪৭	৮	০	৪	০	২৬০	৫০	৮৩
১৩.	উত্তর ক্ষিলগ্রাম	১০৬	১২	১	২	১	১১১	১৭	৩৪

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো, ২০১১, তাং ০৩ জানুয়ারী ২০১৩।

http://w.w.w.bbs.gov.bd/web. Test Application/userfiles/Image/census 20.

উপসংহারঃ

মানচিত্র থেকে বোঝা যায় ডাসার ইউনিয়নটি বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। ইউনিয়নটির ভৌগোলিক অবস্থান, কৃষিগত অবস্থান, হাট-বাজারের বর্ণনা, স্যানিটেশন সুবিধা প্রভৃতি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিবিড়, ছায়াঘন কৃষিকাজে নিয়োজিত একটি গ্রাম। ছকগুলোর তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলিত একটি গ্রাম। পেশাজীবী শ্রেণীর লোকজন খুবই কম। কিছু কিছু টেকনিশিয়ান কাজেও জড়িত রয়েছে।

অধ্যায় ৬

বিরোধ নিরসনে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

৬. ক. গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

ভূমিকাঃ

গ্রাম বলতে আমরা বুঝি শহর থেকে বিচ্ছিন্ন এক জনগোষ্ঠী। অর্থাৎ এমন কিছু মানুষ যারা নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। গ্রাম পড়ে আছে পিছনে। তার জীবন-যাত্রাও প্রাচীন। এখনো সে টুক-টাক করে নিজের মতো থাকার চেষ্টা করে। তারই মধ্য দিয়ে তাকে বিভিন্ন রকমের সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। গ্রামের ছোট-ছোট সমস্যাগুলোর মোকাবেলা আজও তারা স্থানীয়ভাবে কিছু কিছু ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাধান করে থাকে। নিম্নে প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সমগ্র বিশ্বে উনবিংশ শতাব্দীর জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর জীবনযাত্রার মানের তুলনা করলে একটি বিরাট উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়। এই উন্নয়নের ধারাটি শুধুমাত্র শহরেই পরিলক্ষিত হয় না, শহর উপশহর, মফস্বল এমনকি গ্রামে তা পরিলক্ষিত হয়। রাস্তাঘাট উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, মানুষের মান, মূল্যবোধ প্রভৃতিরও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আধুনিকীকরণের ধারায় মানুষের মৌলিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা, নেতৃত্বের ধরণও পাল্টে গেছে। এই ধারা অর্থাৎ রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা এবং নেতৃত্বের ধরণ গ্রাম পর্যায়েও নাড়া দিয়ে এক নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। গ্রাম বাংলার ক্ষমতা কাঠামোর প্রচুর রূপান্তর সাধিত হয়েছে। যে পরিমাণে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে সংকট একেবারে সেই পরিমাণে কমে যায়নি। বরং নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধারায় নতুন নতুন

ক্ষমতার সংকটও বেড়ে যাচ্ছে। রাস্তাঘাট উন্নয়নের সাথে সাথে গ্রামে টাউট বাটপার, দালাল, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাইকারী, হাইজাকার প্রভৃতির সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। চাষাবাদ থেকে শুরু করে পারিবারিক সংকট, জ্ঞাতিগোষ্ঠী সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব, পাড়ায়-পাড়ায় প্রতিবেশি থেকে প্রতিবেশি হাটবাজার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানাদির সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যতটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ততটা উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। যার কারণে ঝগড়া বা কোন্দল কোন অংশে কমে না গিয়ে বরং বেড়েই চলছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কোন একটি পরিবারের ছেলে হয়তো শহরে এসে চাকুরি করছে। সেখানেই সে বিয়ে করে সংসার করছে, তার বাবা-মা বা অন্য ভাইবোনদের সহযোগিতা করছে না। ফলে পারিবারিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে মারাত্মক আকারে।

এক পাড়ার লোকজন হয়তো বা ক্ষমতাধারী রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে বেশি সুযোগ-সুবিধা অর্জন করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান অথবা চাষাবাদের ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহার করে সেই পাড়ার উন্নয়ন সাধিত করছে। এই সুযোগ-সুবিধাটুকু অন্য পাড়ার লোকজন বিরোধী কোনো পার্টিকে সমর্থন করার সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে পাড়ায় পাড়ায় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। যারা একটু সম্পদশালী তারা শহর থেকে বিভিন্ন মালামাল সংগ্রহ করে গ্রামে নিয়ে বিক্রি করছে। এতে সাধারণ ব্যবসায়ী-শ্রেণী অথবা পাইকারী বিক্রেতা-শ্রেণী মার খাচ্ছে। কাজেই ব্যবসায়-বাণিজ্যেও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। এমনি করে সকল স্তরেই বিভিন্ন আকারের কোন্দল সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমান আধুনিক

বাংলাদেশ সরকার গ্রামীণ পর্যায়ের বিভিন্ন রকমের অসুবিধা দূর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। যেমন ঃ

১. ইউনিয়ন পরিষদ

২. গ্রাম সরকার

৩. প্রতিরক্ষা বাহিনী

৪. স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান (১৮৮৫ সালে ইউনিয়ন কমিটি, ১৯১৯ সালে ইউনিয়ন বোর্ড, ১৯৫৯ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং গণ-কমিটি (হাট-বাজারের দায়িত্ব পালন করে)।

৫. গ্রাম চৌকিদার

৬. গ্রামীণ আদালত

৭. পুলিশিং কমিটি।

সরকারি আধুনিক বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকা স্বত্ত্বেও গ্রামীণ পর্যায়ের সকল দ্বন্দ্ব-কলহ তারা মিটাতে সক্ষম হয়নি। A K M Aminul Islam: তার একটি সমীক্ষায় বলেছেন যে, "সত্তরের দশকের প্রথম দিকেই পুরনো ও আধুনিক ধাঁচের গ্রামীণ নেতৃত্বের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়, সে সময়ই অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃত্ব প্রবীণ ও ঐতিহ্যাশ্রয়ী নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ দিতে শুরু করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন"। আর বিকাশমান ও নেতৃত্বের সঙ্গে স্থানীয় ও জাতীয় রাজস্ব সরাসরি সম্পর্ক থাকার কারণও তিনি উল্লেখ করেছেন। এদের তিনি ব্রোকার বা দালাল বলতেও দ্বিধা করেননি (আতিউর রহমান, ১৯৮৯ ঃ ৬১)।

এ ধারার নেতৃত্ব দিন দিন আরো শক্তিশালী হচ্ছে। গ্রামীণ সমাজ ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দ্বন্দ্বে গ্রামবাংলা ধীরে ধীরে তার পুরনো ঐতিহ্য ছেড়ে নতুন মূল্যবোধ ও আচার মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। আধুনিক গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের গুরুত্ব বাড়ছে। করিম আরো দেখিয়েছেন যে, 'গ্রামীণ ক্ষমতা' কাঠামোতে যারা আধিপত্য স্থাপন করেছে তারা বয়সে তরুণ ও আগের দিনের নেতাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি শিক্ষিত। তবে এদের বেশির ভাগই আবার পুরনো ক্ষমতাবানদেরই সন্তান। সেই অর্থে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে মৌলিক কোন রূপান্তরের সম্ভাবনা তিনি লক্ষ্য করেননি (আতিউর রহমান, ১৯৮৯ ঃ ৬২)।

শুধু তাই নয় তিনি তার গবেষণায় আরো স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন যে, A. K. M. A ইসলাম যে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের কথা ইঙ্গিত করেছিলেন, বর্তমানে তারা তাদের অবস্থান আরো সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছেন। নেতৃত্বের নতুন আদল সৃষ্টি হয়েছে ঠিকই কিন্তু পুরনো আদলের গুরুত্ব এটুকুও কমে যায়নি (আতিউর, ১৯৮৯ ঃ ৬২)। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায় যাবার জন্য গ্রামীণ মানুষের এক ধরনের নৈতিক সমর্থনের প্রয়োজন হয়। আর পুরনো কাঠামো অর্থাৎ সমাজ এখনো সেই বৈধতা প্রদানের প্রক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমাজ এক ধরনের যৌথ সংগঠন। এ সংগঠনের কোন লিখিত নিয়মনীতিও নেই। এই অলিখিত অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে সমাজে বসবাসকারী সকল পরিবারই সুখে শান্তিতে বসবাস করে।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ যেমন পৌরানিক কাহিনীতেও সমাজের অলিখিত অনুশাসনের কথা উল্লেখ আছে। বিষ্ণুর মতে, কেউ সার্বজনীন সম্পত্তির ক্ষতি করলে, তা চুরি বা আত্মসাত করলে, সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অমান্য করলে দণ্ডিত হতো। মনুর মতে, কেউ গ্রাম, দেশ বা সংঘের সিদ্ধান্ত অমান্য করলে তাকে দণ্ডিত ও বিতাড়িত করা হতো। কাত্যায়নের মতে, সংঘ ও সমিতির সিদ্ধান্ত রাজার সিদ্ধান্তের তুল্য ছিল। মৌর্য আমলে সংগঠিত কেন্দ্রীয় শাসন পদ্ধতি প্রচলিত হলে সংঘ ও সমিতিগুলির ক্ষমতা লোপ পায়। কিন্তু গ্রামের শাসনভার তখন রাজার নিযুক্ত গ্রামাধ্যক্ষ, দশ গ্রামাধ্যক্ষ, শত গ্রামাধ্যক্ষ ও দেশাধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত ছিল। এ সকল কর্মকর্তার অন্যান্য কর্তব্যের মধ্যে অপরাধ দমন করা অন্যতম কর্তব্য ছিল (বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন, কাজী এবাদুল হক, পৃ. ৫০-৫১)।

মহান রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পর আরবের মক্কা নগরীতে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন আরব দেশ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। গোত্রের লোকদের নিজেদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ হলে তখন গোত্র প্রধান বা প্রধানগণ তার বিচার করতেন। কিন্তু এক গোত্রের লোক অন্য গোত্রের লোকের কোনো ক্ষতি করলে তা মীমাংসা করতে প্রচলিত প্রথানুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি গ্রহণ করার জন্যে ক্ষতিগ্রস্থ গোত্রের নিকট সমর্পণ করা না হলে বা ক্ষতিগ্রস্ত লোককে ক্ষতিপূরণ না দেয়া হলে ঐ বিরোধ তখন আপোষে মীমাংসা করা কঠিন ছিল। এর ফলশ্রুতিতে গোত্রে-গোত্রে নিরবচ্ছিন্ন হানাহানি লেগে থাকত। তবে ঐরূপ বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্যে নিরপেক্ষ সালিশ (আল-হাকিম) ও বিচারক (আল-কাজি) নিযুক্ত করারও নিয়ম তখন প্রচলিত ছিল।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মদিনা আগমনের কিছুকাল পর তিঁনি মুসলমানদের পক্ষে মদিনার ইহুদি গোত্রগুলির সঙ্গে এক লিখিত চুক্তি করেছিলেন। ঐ চুক্তিপত্র 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত। ঐ চুক্তিপত্রে তৎকালে মক্কা ও মদিনার গোত্রগুলির মধ্যে প্রচলিত নরহত্যার পরিবর্তে নরহত্যা বা ক্ষতিপূরণ দান, আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করা, বন্দি মুক্তির জন্যে মুক্তিপণ প্রদান, গোত্রের প্রচলিত প্রথা পদ্ধতি ভঙ্গকারীকে গোত্র থেকে বহিষ্কার করা, কোনো বহিস্কৃত ব্যক্তিকে তার গোত্রের সম্মতি ভিন্ন অন্য গোত্রে আশ্রয় দান না করা প্রভৃতি প্রথাগত নিয়মগুলি স্বীকার করা হয়েছিল (বিচার ব্যবস্থার বিবরণ, কাজী এবাদুল হক, পৃ. ১৩০-১৩১)।

সমাজের অলিখিত অনুশাসন কিছু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। যেমন ঃ

১. গ্রাম সালিশ।

২. গ্রাম আদালত।

৩. সভা।

৪. গ্রাম সমিতি/সমবায় সমিতি।

৫. গ্রামের মাতব্বর শ্রেণী, মোড়ল শ্রেণী।

৬. বংশ প্রধান।

৭. গোষ্ঠি বা জ্ঞাতি প্রধান।

৮. ক্লাব কমিটি।

৯. দুর্মুজ কমিটি।

১০. গ্রামের স্কুল কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, স্বনামধন্য ব্যক্তি।

১১. যুবক শ্রেণী।

১২. ইমাম ও পুরোহিতবৃন্দ।

১৩. আত্মীয়স্বজন বা আত্মীয়তাভিত্তিক দল।

১৪. গ্রামের চেয়ারম্যান, মেম্বার।

উপসংহার ঃ এই প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের অলিখিত ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে সমাজে দ্বন্দ্ব-কলহ কমে না গিয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায়শই বাঁধাগ্রস্থ হয়েছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যুগে যুগে সমাজবদ্ধ মানুষেরাই উদ্যোগ নিয়েছে এবং চেষ্টা করেছে বিবাদ-কলহ শান্তিপূর্ণভাবে নিরসন করে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে। সমাজ জীবনকে সুষ্ঠু ও সাবলীল রাখার প্রচেষ্টায় আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত এইসব অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান সক্রিয়ভাবে কাজ করে আসছে।

৬. খ. গ্রাম্য সালিশের ভূমিকা

সালিশের মাধ্যমে যে বিচার হয় তার প্রকৃতি প্রায় ক্ষেত্রেই সরকারি আদালতে যে রায় হয় তার চেয়ে ভিন্ন রকম হয়। ঝগড়ার বিভিন্ন পক্ষ এবং মাতব্বরদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি বাস করতে হয়। তাই সালিশে প্রায়ই ঝগড়ার একটি আপোষ মীমাংসায় পৌঁছার চেষ্টা করা হয়। মাতব্বররা ঝগড়াকারীদের কাছাকাছি বাস করায় তাদের পরিবারের জীবন বৃত্তান্ত জানেন। আদালতের বিচার সুষ্ঠু বিচার বলে

দাবী করা যায়। ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সরকারি আদালতের চেয়ে গ্রাম্য আদালতে বেশি বিবেচনা করা হয়। এই সম্পর্কে শশিকর (গ্রাম) নিবাসী বিশ্বাস গোষ্ঠীর মাতব্বর বাবু সূর্যকান্ত বিশ্বাস (প্রয়াত) তার দেয়া এক সাক্ষাতকারে বলেন, "গ্রামে যখন কলহ-বিবাদ ঘটে, তখন আমরা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মিটমাট করার জন্য সালিশী বোর্ড বসাই। উভয় পক্ষ তাদের ইচ্ছামত যেকোনো ব্যক্তিকে সালিশদার হিসেবে মেনে নেয়। নির্দিষ্ট দিনে পক্ষদ্বয়, সালিশদারদের ডেকে আনে, তখন জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা উভয় পক্ষের ঝগড়া বা কলহের কারণ বর্ণনা করে। তখন সালিশদারগণ প্রয়োজন হলে তাদের বিবেকের উপর নির্ভর করে অথবা পক্ষদ্বয় মানিত স্বাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদানে যাহা ন্যায় বা অন্যায় বলে বিবেচিত তার উপরে বিচারের রায় ঘোষণা করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে যাহাদের অপেক্ষাকৃত দোষী বা অন্যায়কারী বলে বিবেচনা করেন তজ্জন্য সামাজিকভাবে দণ্ডের বিধান করেন। সামান্য ত্রুটির জন্য করপোরাল (Corporal punishment) (শারীরিক শাস্তি) দেয়া হয়। আরো যদি ভবিষ্যতে ঐ রকম অপরাধ প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা হবে বলে শাসিয়ে দেয়া হয়।

অপরাধ যদি গুরুতর বলে প্রমাণিত হয় তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড করা হয়। যদি অপরাধীগণ নিজের দোষ উপলব্ধি করতে পারে এবং অনুশোচনা করে তাহলে ক্ষমাপ্রার্থী হলে অনেক সময় ক্ষমা করে দেয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো পক্ষ সালিশী বোর্ডের রায় অমান্য করে থানা কিংবা কোর্টের আওতায় নেয়। আবার অনেক সময় দেখা যায়, উর্দ্ধতন জ্ঞানীলোকদের নিকট পুনর্বিচারের প্রার্থনা জানায়। তখন

পুনর্বিচারকালে পূর্বতন সালিশদারদের ডাক আসে। তারা যদি মনে করেন যে, পূর্বের বিচারে ত্রুটি আছে তাহলে তাদের সহযোগে নতুন রায় ঘোষণা করেন।

পক্ষদ্বয়ের একগুয়েমির কথা চিন্তা করে অনেক সময় 'অচলনামা' করে সালিশী করতে বাধ্য করে। এতে ঝগড়াকারীদের এই অচলনামার প্রতি ভয় থেকে যায়। ইচ্ছে করলে সালিশদারগণ এই অচলনামার সাক্ষ্য নিয়ে কোর্টে মামলা করতে পারেন। কোনো কোনো সময় সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ঠিক পথে আসার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মধ্যস্থ ব্যক্তির নিকট জমা রাখতে হয়। বিচারের পরে দোষী ব্যক্তির টাকা ফেরত দেয়া হয় না।

জমির দখল, নিলাম সংক্রান্ত ঘটনাগুলি মাতব্বরগণই মীমাংসা করে থাকেন। জমির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে পার্শ্ববর্তী গ্রাম শশিকর নিবাসী দারিক হালদার (গ্রাম্য মোড়ল) তার সাক্ষাতকারে বলেন, "জমিজমার সরহদ্দ বা সীমানা নিয়ে যে গোলমালের সৃষ্টি হয় তা নিরসনকল্পে প্রথমে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ খরচা জরিপের দ্বারা ঠিক করে দেন। যদি তাতেও সঠিক মীমাংসায় না পৌঁছানো যায় তাহলে গ্রাম্য আমীন বা সার্ভেয়ার দ্বারা জরিপ করে খুটি গাড়ি করে দেয়া হয়"। এইভাবে জমি-জমার গোলমালের মীমাংসা করা হয়। যদি সীমানার গোলমাল মিট-মাট না হয় তাহলে জমির ফসল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কিংবা জোরদার ব্যক্তিবর্গ ফসল নিয়ে যায়। এতে বিপক্ষ কোর্টের আশ্রয় নিতে চাইলে গ্রাম্য মোড়লগণ বাঁধা দিয়ে তা সুমীমাংসা করতে চেষ্টা করেন। কারো স্বত্ববিশিষ্ট জমিজমা বেদখলী হলে গ্রাম্য মোড়লগণ ঐ সম্পত্তি বাস্তবে কার প্রাপ্য তার সুমীমাংসা করে দেন।

যদি প্রকৃত স্বত্ববিশিষ্ট ভূ-সম্পত্তিতে দখল না পায়, তাহলে আদালতের মারফত বিচার করে নেয়। আদালত দখল নামার কোর্টে আইনত কর্মচারীর দ্বারা দখল বুঝিয়ে দিতে আসে। তখন গ্রাম্য লোকজন ডেকে ঢোল দ্বারা জানিয়ে দেয় ঐ জমি আবেদকারীর তদবধি তার বলে স্বীকৃতি পায়।

এখানে দারিক হালদার (গ্রাম্য মাতব্বর) বলেন, "আমরা সেই অবস্থার সৃষ্টি হতে দেই না। যখন বৃটিশ সরকার এই ভারতবর্ষ শাসন করতো, তখন জমিদারী প্রথা চালু ছিল, প্রজাদের নিকট হতে খাজনা আদায় করত। তখন দেখা যেত প্রজারা খাজনা দিতে অপারগ হলে তাদের জমি নিলাম করে নিত। দারিক হালদারের ভাষায় বৃটিশ শাসনের অব্যবহৃত পরে গ্রামাঞ্চলে গ্রামের মাতব্বরগণ গ্রামের জমি সংক্রান্ত ও অন্যান্য সম্পত্তিবিষয়ক দ্বন্দ্ব নিজেদের মধ্যেই মিটিয়ে ফেলে। গ্রাম্য জনগণও তাদের উপর প্রচুর নির্ভরশীল এবং বিশ্বাসী ছিল। তাদের মতামতকে আদালতের সিদ্ধান্তের মতই মান্য করতো। কোর্ট বা আদালতে যাওয়া তাদের পক্ষে ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তারা মনে করত গ্রাম্য ঐতিহ্য নষ্ট হয় এবং তাতে সামাজিক বিশৃংখলা দেখা দেয়। তাদের মতে গ্রামের জনগণের মধ্যে সুহৃদয় নষ্ট হলে আন্তরিকতার অভাব ঘটে। বৃটিশ শাসনকালে জমিদারগণ জমিদারী প্রথা অনুসারে নির্দিষ্ট জমি চাকরান হিসেবে প্রজাদের দিয়ে দিতেন। যেমন ডাসার গ্রামের পাল ও কুম্ভকারের জমি, নাপিতের জমি, ধোপার জমি ইত্যাদি। ঐ জমি ভোগ করে জমিদারের কাজ করে দিত। মজুরী বাবদ নগদ অর্থ দেয়া হত না। গ্রামের মোড়লগণ ঐ সকল গরীব প্রজাদের প্রতি আন্তরিক হয়ে থানায় গিয়ে ঐ

সকল জমি A/S রেকর্ডে স্থায়ীভাবে প্রজাদের নামে রেকর্ড করিয়ে দিতে সাহায্য করতেন।

বহুদিন ধরে গ্রামে যেসকল প্রজা ধনীব্যক্তিদের ভিটাবাড়িতে বসবাস করত, মোড়লগণ তাদের ঐ বসত বাড়িটি R/S রেকর্ডে ঐ সকল গরীব প্রজার নামেই রেকর্ড করিয়ে দিত। দর্শনা গ্রামের নাপিত বাড়ি, সূত্রধর মিস্ত্রির বাড়ি এইভাবে রেকর্ডকৃত হয়ে আছে। এজমালি বাড়ির সীমানা নিয়ে শরিকে শরিকে গোলমালের সৃষ্টি হলে উহাতে স্থানীয় সালিশ বা মোড়ল ঠিকমত মীমাংসা করিয়ে দিত। যার ফলে যার যার জায়গা সঠিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

এজমালি ঘরদরজা নিয়ে যখন ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব হয় অথবা পৃথক অন্ন বাস করতে চায় তখন ঘরের মূল্য অনুযায়ী তুল্য ভাগ করে নেয়। আবার অনেক সময় দয়ালু ভাই হলে অন্য ভাইকে নিদাবী ছেড়ে দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

ছাগ, মহিষ, গো, ব্যৎসাদির বেলায়ও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পিতা মাতার মৃত্যু হলে ঔর্দ্ধদেহী ক্রিয়াকলাপের সময় জ্ঞাতিবর্গ বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যে প্রাচীন রক্ষণশীল খাওয়ানোর ব্যবস্থা আছে তাতে অনেক সময় সামাজিক কোন্দল শুরু হয়। ঐ সময় মৃত ব্যক্তির সন্তানেরা গ্রাম্য জ্ঞানীবর্গের ডাকে যে কোনভাবেই হোক উহার মীমাংসা করে পংক্তি ভোজনের ব্যবস্থা করে দেয়। তখন সপণ্ডিতগণের মধ্যে শান্তি বিরাজ করতে থাকে।

পিতা-মাতার মৃত্যু হলে পাড়া প্রতিবেশি যারা থাকেন পাড়ার প্রধান, গ্রামের মাতব্বর, আত্মীয়-স্বজন ডেকে তবেই তার অন্তস্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। এই সময় গ্রাম্য মাতব্বরগণ যদি সঠিকভাবে এগিয়ে না আসেন তাহলে মৃত ব্যক্তির সৎকারে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। মৃত ব্যক্তির সংসারে যদি কোন ধরনের পারিবারিক কোন্দল থাকে তাহলে এই সময় গ্রাম্য মাতব্বরগণ এবং আত্মীয়-স্বজন তাদের ঐ পরিবারের সবাইকে ডেকে মীমাংসা করে তবেই তার অন্তস্টিক্রিয়া করা হয়।

নিম্নে গ্রাম সালিশে বিচারিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হওয়া কয়েকটি কেস স্টাডি উল্লেখ করা হলো।

১নং কেস

যৌতুকের বিচার ঃ মোসা মনিকা বেগম, বয়স ২৩ বছর। ডাসার ইউনিয়নের কাজী বাকাই গ্রামের বাসিন্দা। ছেলে মো: রিপন হাওলাদার, বয়স ২৭ বছর। পিতা: মো: ছুলোমান হাওলাদার একই গ্রামের বাসিন্দা। পিতা ছুলোমান হাওলাদার ঢাকার নীলক্ষেত এরিয়ায় বেডিং-এর দোকানের মালিক। পিতার ব্যবসার কাজেই ছেলে মো: রিপন হাওলাদার ঢাকায় বসবাস করে। ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বন্ধুদের বাসায় বেড়াতে যায়। বন্ধুর বাড়ির পাশের বাড়িটিই ছিল মনিকাদের বাড়ি। সেখানেই মনিকার সাথে তার পরিচয় এবং প্রণয়। এই প্রণয় থেকেই পরে বিবাহ। গত ২১/০৫/২০০৮ তারিখ পারিবারিক পরামর্শ ছাড়াই বন্ধুদের সহাযোগীতায় রেজিস্ট্রেশন কাবিন মূলে তাদের বিবাহ হয়। বিবাহের পরপরই তাদের গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

প্রথমাবস্থায় তাদের দাম্পত্য জীবন সুখেই ছিল। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরে সাংসারিক খরচ বেড়ে যায়। মোসা: মনিকা বেগম বাবা মার অসম্মতিতে বিবাহ করে বলে বাবা মা তাকে কোনো সহযোগিতা করে না। ছেলে রিপন বাবার দোকানে খাটে বিধায় বাবা তাকে সামান্য হাত খরচ দেয়। ইতিপূর্বে রিপন ব্যবসা করার জন্য মনিকাকে বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার কথা বলে। মনিকা বলে যে, বাবার সাথে তো আমার যোগাযোগ নেই। টাকা কোথা থেকে আনব। রিপনের অনেক পিড়াপিড়ির পর মনিকা তার দূরসম্পর্কের খালাত ভাই-এর কাছ থেকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এনে দেয়। কন্যা সন্তান বড় হতে থাকে। সাংসারিক খরচ দিন দিনই বেড়ে যায়। রিপন খরচাপাতি ঠিকঠাকভাবে দিতে পারে না। মনোমালিন্য দিনদিন বাড়তেই থাকে, ঝগড়াঝাটি হয়। ফোনে ফোনেই শুধু কথা হয়। রিপন এক বছর যাবত বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। অনেক অনুরোধ করে তাকে বাড়ি নেয়া হয়। গত ১০/০৩/২০১৩ তারিখ রিপন বাড়ি আসে এবং তার আয়রোজগার ভাল না বলে মনিকার কাছে খুলে বলে। সবশেষে মনিকার সন্তানসহ মনিকাকে বাবার বাড়িতে রেখে আসতে চায়। বাবার বাড়িতে রেখে যাওয়ার সময় ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা যৌতুক হিসাবে দাবি করেন। বাবা যৌতুকের টাকা দিতে অস্বীকার করায় মনিকাকে তালাক দিবে বলে হুমকি প্রদান করে। মনিকাকে তার সন্তানসহ বাবার বাড়িতে ফেলে আসতে চাইলে মনিকা তার মেয়ে সন্তানসহ শশুর বাড়িতে চলে যায়। সেখানে রিপন তাকে প্রথম দিন বেদম প্রহার করে। ১০ দিন বাড়িতে ছিল। প্রতিদিনই মনিকাকে যৌতুকের টাকা না আনতে পারলে তালাক দেওয়া হবে বলে হুমকি দেয় এবং মারপিট করে। রিপন ঢাকা চলে আসে। মনিকা উপায়ান্তর না দেখে বাবার বাড়িতে চলে আসে এবং মুরব্বিদেরকে এবং তার

নিকটস্থ আত্মীয়স্বজনকে ডেকে সব ঘটনা খুলে বলে। মনিকার বাবা মো: আবুল শেখ রিপনের বাবা মোঃ ছুলোমান হাওলাদারকে সব কথা ফোনে বলে এবং সমস্যার সমাধান করার কথা বলে। কয়েক দফায় মনিকার বাবা তার আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে রিপনের বাবার কাছে ফোন করে। কিন্তু রিপনের বাবা সমস্যার কোন সমাধানে আসে না। মনিকার বাবা লোক মারফতে খবর পায় যে, গ্রামে লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশনের কর্মী আছে এবং তার মাধ্যমে যৌতুকের দায়ে পারিবারিক কেস করা যায়। অবশেষে গত ১৮/০৫/২০১৩ তারিখ পারিবারিক কেস করা হয়। পারিবারিক কেসের লিগ্যাল নোটিশ পেয়ে রিপন এবং তার বাবার টনক নড়ে উঠে। উপায়ান্তর না দেখে গত ২৯/০৫/২০১৩ তারিখ রিপনের বাবা এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তি ও আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে সালিশের ডাক দেন। সালিশের স্থান নির্ধারণ করা হয় ডাসার ইউনিয়নের কাজী বাকাই গ্রামের হানিফ মেম্বারের বাড়ি। বেলা ১১ টার সময় হানিফ মেম্বারের বাড়িতে বসা হয়। সালিসে উপস্থিত ছিলেন মৃধা আবুল কালাম আযাদ, বয়স ৫৫, এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তি, শরিফ জানে আলম, বয়স ৪৫, প্রতিবেশী সৈয়দ বুলু, বয়স ৫০, সৈয়দ বংশের প্রভাবশালী সৈয়দ ওহিদুজ্জামান, বয়স ৪০ বছর, সৈয়দ বংশের প্রভাবশালী মো: আলমগীর, বয়স ৩০ বছর, রিপনের বন্ধু মোঃ সায়েম শেখ বয়স ৩৫ বছর, মনিকার চাচাত ভাই মো: উজ্জ্বল হাওলাদার, বয়স ৪০ বছর, রিপনের দুলাভাই আব্দুর রশিদ শেখ, বয়স ৪২ বছর, মনিকার চাচাত ভাই মোঃ মাহবুব আলম, বয়স ৩২ বছর এবং মনিকার প্রতিবেশী আবুল শেখ, বয়স ৪৫ বছর ও মনিকার চাচা।

সালিশের নিয়ম অনুযায়ী বেলা ১১ টায় হানিফ মেম্বারের বাড়িতে বসা হয়। সালিশে বয়সে সবচেয়ে বড়, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি মৃধা আবুল কালাম আযাদকে সভাপতি করা হয়। মনিকার চাচা আবুল শেখকে ঘটনার বর্ণনা করতে বলা হয়। মোঃ আলমগীর (রিপনের বন্ধু) আলোচনার মাঝে মাঝে উঠেই সমস্যার সমাধান করতে অনুরোধ করে। কিন্তু মনিকার বাবা এবং মা রিপনের বাবার অনুপস্থিতিতে কোনভাবেই সমস্যার সমাধান হবে না বলে জানিয়ে দেয়। রিপন, তার বন্ধু এবং এলাকার গণ্যমান্যদেরকে পুনরায় সালিশের দিন ধার্য্য করার কথা বলা হয়। ১৭/০৬/২০১৩ তারিখে রিপনের বাবাসহ পূর্বতন সালিশদেরকে নিয়ে বসা হয়। একইভাবে একই মেম্বারের বাড়িতে সালিশ বসানো হয়। রিপনের বাবাকে সবিস্তারে ছেলে এবং মেয়ের ঘটনা জানানো হয়। মনিকার বাবা মাকে লিগ্যাল এইড থেকে কেস উঠিয়ে আনার কথা বলা হয়। কিন্তু মনিকার চাচারা মুচলেকা দেয়া ছাড়া কেস উঠানো যাবে না বলে দাবি করে। সাথে এও দাবি করে যে, ছেলে মেয়েতে ভালবাসা করে বিয়ে করেছে। তারপরে ছেলে কেন যৌতুকের দাবি করে। আমরা কোনভাবেই এই মেয়েকে কাবিন নামার অঙ্গীকার দেখা ছাড়া ছাড়তে পরি না। এই সালিশেই কাবিন নামা উপস্থিত করার কথা বলে। কাবিন নামায় মাত্র ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার দেনমোহরের কথা উল্লেখ আছে। মনিকার চাচারা উল্লেখ করেন যে, হুজুর ডেকে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার দেন মোহর ধার্য্য করতে হবে। রিপনের বাবা আপত্তি তোলে এবং বলে যে, বিবাহ একবারই হয়। আমার ছেলে আমাকে না জানিয়ে বিবাহ করেছে। এইজন্য আমি তার কোন দায়ভার নিতে চাইনি। কিন্তু আমি এই সালিশ সভায় কথা দিচ্ছি আমার পুত্রবধু এবং

নাতনির দায়ভার আমার। আর কোন সমস্যা হবে না। তবে মনিকাকে লিগ্যাল এইড থেকে কেস উঠিয়ে আনতে হবে।

সালিশে লিগ্যাল এইড কর্মী জনাব মোর্শেদা বেগমও উপস্থিত ছিলেন। মোর্শেদা বেগম কেস উঠিয়ে আনার ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন বলে কথা দেন। সবশেষে সভাপতি সাহেব রিপনের বাবার হাতে সবার সম্মতিক্রমে মনিকা এবং তার মেয়েকে তুলে দেন। ছেলের পক্ষ থেকে সালিশদারদের জন্য খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। সবাই বিকেল ৪ টার দিকে খাবার খেয়ে যার যার গন্তব্য স্থানে চলে যায়।

ডাসার গ্রামের মতবর শ্রেণী এবং মেম্বারদের সহযোগিতায় বিচারকার্য পরিচালনার একটি দৃশ্য।

২ নং কেস

রোজিনার পরিবার ঃ

মোসাঃ রোজিনা বেগম, বয়স ১৯ বছর এবং মোঃ মনির বেপারী, বয়স ২৭ বছর। দু'জন ডাসার থানার অধীনস্ত ধামুসা এবং পূর্ব মাইজপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে তাদের পারিবারিকভাবেই বিবাহ হয়। বিবাহের কিছুদিন যেতে না যেতেই স্বামী মনির বেপারী স্ত্রী রোজিনাকে বিভিন্নভাবে মারধর করে। কথায় কাজে মিল না থাকলেই রোজিনাকে মারধর করে। রান্না ঘরের চুলার পার থেকে টানাহিচড়া করে নিয়ে আসে। রোজিনা অনেকবারই বাবার বাড়িতে চলে যায়। তার বাবা মা বুঝিয়ে পুনরায় স্বামীর বাড়িতে দিয়ে আসে। কিছুদিন যেতে না যেতেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সবশেষে রোজিনাকে রান্নাঘর থেকে টেনে এনে উঠানে ফেলে বেদম প্রহার করে। এক পর্যায়ে রোজিনা বেহুশ হয়ে যায়। বাড়ির লোকেরা পানি খাইয়ে এবং মাথা ঠাণ্ডা করে রোজিনাকে কোনরকম হুশ করে তোলে। রোজিনা উপায়ন্তর না দেখে পাশের এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং ওখানেও সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আত্মীয় স্বজন রোজিনার বাবা মা ও ভাইদেরকে খবর দেয়। বাবা মা ভাই তাকে নিতে আসে। এই সময় মনির রোজিনাকে তার কাছে নিয়ে আসতে চায়। বাবা মা আর রাজি হয় না এবং মনির বেপারীর সঙ্গে তাদের তুমুল বাক বিতণ্ডা হয়। কথা প্রসঙ্গে জানা যায় রোজিনা গর্ভবতী। এলাকার লোক যখন ভয় দেখায় রোজিনার গর্ভবতী অবস্থায় মনির বেপারীর নামে কেস দিলে সে জেল খাটবে। মনির বেপারী ভয়ে ডাসার থানায় এসে জি.ডি. করে। পরবর্তীতে কয়েক দফায় দফায় মনির বেপারী গ্রামের আত্মীয়স্বজন ও মুরব্বিদের নিয়ে সালিশ ডাকে। রোজিনার পক্ষ কোনভাবে মনিরের ডাকা সালিশে বসতে রাজি

নয়। রোজিনার বাবা মায়ের বক্তব্য মেয়ের এই অবস্থাতে কোন মতেই মনিরের হাতে মেয়ে দেয়া যাবে না। কারণ মনিরের সংসার মনিরের কথায় চলে না। তার বড় ভাই, ভাবীরা মিলে মনিরের অন্যত্র বিবাহ ঠিক করেছিল। সেখানে তারা ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা পাবে বলে চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু মনির তাদের কথায় তখন বিবাহে রাজী হয়নি। এখন তারা যৌথ সংসারে বাস করে। ভাই-ভাবী তাকে রোজিনাদের বাড়ি হতে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা আদায় করতে বলে। না পারলেই মনিরের উপরে চাপ আসে এবং মনির রোজিনাকে মারধর করে।

এমতাবস্থায় কয়েক দফা বিচারের ব্যবস্থা নিয়েও যখন মনির রোজিনার পক্ষ থেকে সাড়া না পায় তখন মনির মাদারীপুর লিগ্যাল এইডের শরাপন্ন হন। লিগ্যাল এইডের মহিলা মাঠকর্মী মোরশেদা বেগম দুইপক্ষের আত্মীয়স্বজন ও মুরব্বিদের ডাকতে সক্ষম হন। প্রথমবার সেপ্টেম্বর মাসের ৩ তারিখে তাদের নিয়ে রোজিনার বাবা-মায়ের পক্ষের কথাই শোনা হয়। রোজিনার বাবা মায়ের দাবী এমতাবস্থায় রোজিনা মনিরের বাড়িতে গেলে পেটের সন্তান মেরে ফেলবে এবং তাতে আমাদের মেয়েও মারা যেতে পারে। মনিরের পক্ষের সালিশীরা জানতে চায় তাহলে আপনাদের মেয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কি। রোজিনার বাবা মা বলে সন্তান সুস্থ্যভাবে জন্ম নিবে এবং তারপরে সন্তানের খোরপোশসহ রোজিনার দেন মোহরানার টাকা দিয়ে আমাদের মেয়ে আমরা নিয়ে আসবো। মানিরকে জিজ্ঞেস করা হয় তাতে সে রাজী কীনা। মনির বলে তা কখনই হবে না। আমি আমার ভবিষ্যত সন্তানসহ স্ত্রীকে তালাক দিতে পারব না। এমতাবস্থায়, মনির আর একদিন সময় চেয়ে নেয়। অবশেষে গত ১৯/০৯/২০১৩ তারিখ ডাসার থানার

মনির চেয়ারম্যানের বাড়িতে তারই নেতৃত্বে দুই পক্ষেরই আত্মীয়-স্বজন ও এলাকার মুরব্বিদের নিয়ে বসা হয়। সেখানে মাদারীপুর লিগ্যাল এইডের মোরশেদা বেগমও উপস্থিত ছিলেন। দুই পক্ষের কথা যখন হয়, তখন মনির একসময়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে এবং উপস্থিত সকলের হাত পা ধরে। কোনভাবেই মনির বেপারীকে থামানো যাচ্ছিল না। একপর্যায়ে মনির চেয়ারম্যান ২০০/- (দুইশত) টাকার ষ্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নিয়ে মুরব্বিদের সাথে নিয়ে মনিরের হাতে রোজিনাকে তুলে দেয় এবং পরে সালিশ দ্বারা উল্লেখ করে যে, এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে এর কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। মনিরের নামে কেস করা হলে এর কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। অবশেষে সকলের উপস্থিতিতে মনির থানা থেকে জিডি উঠিয়ে নিয়ে আসে।

মহিলা মেম্বারদের দ্বারা বিচার প্রক্রিয়া

উপসংহার ঃ গ্রাম সালিসের মাধ্যমে বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সময়ের বিবর্তনে সালিস ব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, বিবাদ-কলহ নিরসনের জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী মাতব্বরগণ এগিয়ে এলেও নিজেদের স্বার্থে সালিশী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। ফলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়নি ন্যায় বিচার ও সামাজিক স্থিতিশীলতা। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সাধারণ মানুষ। প্রতিষ্ঠা পায়নি মানুষের ন্যায্য অধিকার। পাশাপাশি এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এগিয়ে এসেছে সমাজের কিছু উদ্যোগী মানুষ। যারা চায় সমাজে মানুষ শান্তি ও উন্নয়নের মাঝে বসবাস করুক। নিজস্ব পরিবেশ ও পরিচিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এবং প্রয়োজনে প্রচলিত আইনের আলোকে বিরোধ মিমাংসাই তাদের উদ্দেশ্য।

এ প্রেক্ষাপটে কালকিনি উপজেলার নবগ্রাম ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব রুহিদাস মন্ডল তার এক সাক্ষাতকারে বলেন, গ্রামের সামাজিক সালিশীর ক্ষেত্রে কোন বিচার করার জন্য স্ট্যাম্পে লিখিত নেওয়ার বিধান ছিল না। স্ট্যাম্পে লিখিত নেয়ার বিধান শুধুমাত্র কোর্টেই গ্রহণযোগ্য হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সালিশীর দ্বারা বিচার কার্য যাতে এড়িয়ে না যেতে পারে তার স্বাক্ষ্য হিসেবে স্ট্যাম্পে লিখিত হয়। অনেক বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করেও বিভিন্ন প্রভাবশালী স্বার্থবাদী লোকদের বাঁধার সম্মুখীন হলেও সাধারণ মানুষের একান্তিক প্রচেষ্টায় সালিশী ব্যবস্থা বর্তমান সমাজে বিরোধ নিরসনে একটি সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হিসাবে সমাদৃত।

৬. গ. জ্ঞাতি ও গোষ্ঠীর ভূমিকা

বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে ঐতিহ্যগতভাবে গোষ্ঠী নামক একটি পিতৃতান্ত্রিক সংগঠনের অস্তিত্ব টিকে আছে। গ্রাম বিষয়ক গবেষক এ. এইচ. এম. জেহাদুল করিম তার একটি গ্রাম বিষয়ক গবেষণায় (বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে গোষ্ঠী মর্যাদার ধরন) গোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন "From kinship point of view, a gosthi is an informal organization through which social relationship involving specific rights and responsibilities binds kinsmen. But beyond that, as a rule, a person in a gosthi is aligned for political action with, and acquires land through his father, and his patrilincal kinsmen" (করিম, ১৯৯২ ঃ ১)।

উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে এটা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, গোষ্ঠীর মাধ্যমেই গ্রামীণ বাংলাদেশে আত্মীয় স্বজনদের সম্পর্ক স্থাপন ও পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সামাজিক কোন্দল এবং তা নিরসনের প্রক্রিয়া এর অধিকাংশটাই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল।

æKinship conflict denotes a conflict either within the kinship group or between kinship obligations and those pertaining to competing inotitutional commitments" (Farber 1981 : 158).

গ্রামীণ সমাজে জ্ঞাতিদের মধ্যকার ঝগড়ার যে প্রধান বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা যায় তা হল ঃ সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা, সমাজ-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি, অর্থনৈতিক লেনদেন, গৃহপালিত পশু-পক্ষীর দ্বারা ফসলের ক্ষতিসাধন ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে বিবাহ, মিলাদ বাৎসরিক পার্বন প্রভৃতি বুঝায়। এই সমস্ত অনুষ্ঠানাদিতে জ্ঞাতিদের অংশগ্রহণ কাম্য এবং জ্ঞাতিরা তা করেও থাকেন। এটা নয় যে, কোন কিছু বিচার বিবেচনা না করে সমস্ত জ্ঞাতিরা এসব অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করেন। তারা বয়স, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা সর্বোপরি সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে অনুষ্ঠানাদিতে তাদের ভূমিকা ও ব্যক্তিত্ব দাবী করে।

গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে (sectors) যেমন- সামাজিকীকরণ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রভৃতি জ্ঞাতিদের বা জ্ঞাতিসম্পর্কের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর কোন অংশ যেমন- ব্যক্তির সামাজিকীকরণ, উৎপাদন সংগঠন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা, আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন ইত্যাদিতে জ্ঞাতিদের ভূমিকা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয় বরং অপরিহার্য (crucial) এবং সিদ্ধান্তমূলক (decisive) আরো উল্লেখ্য যে, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জ্ঞাতিদের ভূমিকা যে কেবলমাত্র গ্রামীণ সীমানার মধ্যে তা নয়, গ্রামীণ সীমানা অতিক্রম করে বাইরের গ্রাম তথা বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশেও (wider social environment) বিস্তৃত।

কিছু কিছু গবেষক গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকাকে অবনয়নশীল (declining) ও পরিবর্তনশীল (changing) বলে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষত: অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন শ্রেণীর (class) উদ্ভব জ্ঞাতি সম্পর্কের ভিত্তি এবং এর বহুবিধ ভূমিকাকে অবনমিত করেছে বা পরিবর্তন ঘটাচ্ছে (Jahangir 1979, Arefeen 1986, Karim 1990)।

গ্রামীণ সমাজে কোন সম্পত্তি (স্থাবর, অস্থাবর) হস্তান্তরের (বিক্রি, বন্ধক, বর্গা ইত্যাদি) বেলায় জ্ঞাতিদের প্রভাব ও প্রাধান্য লক্ষ্যনীয়। গ্রামবাসী জমি বিক্রির বেলায় প্রথমত তার পিতৃসূত্রীয় জ্ঞাতিদের কাছে যান। পরবর্তীতে মাতৃ, বৈবাহিক ও পাতানো জ্ঞাতিদের কাছে যান। সম্পত্তির এই হস্তান্তর বা কেনা-বেচায় জ্ঞাতিদের মধ্যে থেকে ক্রেতা খোঁজার পেছনে গ্রামবাসীর কতগুলো বিবেচনা বা যুক্তি কাজ করে ঃ জ্ঞাতির কাছে জমি খণ্ড বিক্রয় হলে তা পুন:ক্রয় বা পূন:ফেরত পাবার আশা থাকে। জ্ঞাতিদের কাছে সম্পত্তি বিক্রি হলে সেটা প্রকৃতপক্ষে বিক্রি বলে চিহ্নিত হয় না। এক ধরনের সৌজন্য হস্তান্তর বলে বিবেচিত হয়, জ্ঞাতিদের মধ্যে সম্পত্তি বিক্রয়ে সম্মান ক্ষুন্ন হয় না। সর্বশেষে জ্ঞাতিদের মধ্যে সম্পত্তি বিক্রয় হলে জমি বিক্রিতে ন্যূনতম পক্ষে বর্গাকার (sharecropper) হবার আশা করতে পারে (Aziz, 1979)।

গ্রামবাসীরা সহজে গ্রাম্য মহাজন বা ব্যাংকে অর্থ সংগ্রহের জন্য যায় না। কারণ এ সমস্ত উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করলে উচ্চ সুদ (higher interest) প্রদান করতে হয় এবং

অনেক সময় প্রতারিত (cheat) হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই নিজের সঞ্চয় না থাকলে জ্ঞাতিদের বা আত্মীয়দের কাছে যান।

গ্রামীণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জ্ঞাতিদের ভূমিকা বিদ্যমান। ব্যক্তি হোক আর গোষ্ঠী হোক জ্ঞাতিদের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া গ্রামীণ রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা কষ্টসাধ্য। অনেক গবেষক তাই জ্ঞাতিকে গ্রামীণ নেতৃত্বের একটা অন্যতম উৎস হিসাবে গণ্য করেছেন (Karim 1990, Mashreque, 1986)। গ্রামের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রধানত: গোষ্ঠীসমূহের মধ্যকার ঐক্য এবং অনৈক্যের ফলশ্রুতি। বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে এই ঐক্য এবং অনৈক্যের ব্যাপারটা কাজ করে, যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, জাতীয় রাজনীতি, গণপ্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিত্ব (স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ ইত্যাদির কর্তৃত্ব), সমাজ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপন ইত্যাদি।

গ্রামের প্রত্যেকটি গোষ্ঠী বিশেষ করে বড় গোষ্ঠীগুলো চায় ইউনিয়ন পরিষদে তাদের কর্তৃত্ব থাকুক। তাই এই সংস্থার নির্বাচনের সময় তারা প্রার্থী দাড় করায় এবং সম্মিলিতভাবে তাদের প্রার্থীকে পাশ করানোর জন্যে কাজ করে। জাতীয় রাজনীতির ব্যাপারটাও অনুরূপ।

গোষ্ঠীগত প্রাধান্যের কথা বলতে গিয়ে ডাসার ইউনিয়নের সচীব মোঃ জাহিদ হোসেন তার সাক্ষাতকারে বলেন, বর্তমানে ডাসার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কাজী সবুজ পশ্চিম কমলাপুর গ্রামের কাজী বংশের ছেলে। এই গ্রামে আরো অন্যান্য বংশ আছে, যেমন-

হাওলাদার বংশ, শরীফ বংশ, ব্যাপারী বংশ, চোকিদার বংশ, সিকদার বংশ, শেখ বংশ ও মুন্সি বংশ।

ডাসার ইউনিয়নের মধ্যে সবচেয়ে বড় বংশ হলো সৈয়দ বংশ। ক্ষমতাধারী প্রতিষ্ঠানে সবসময়ই সৈয়দ বংশের লোকজনই প্রাধান্য পায়। ডাসার ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রাম যেমন- দর্শনা, কমলাপুর, আইসার। এসব গ্রামের সৈয়দ বংশ ছাড়া কখনই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারে না। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের মধ্যে ৬ জন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মধ্যে ৪ জনই হল সৈয়দ বংশের চেয়ারম্যান। তারা হলেন-

১. সৈয়দ কবির আহম্মেদ
২. সৈয়দ মনির আহম্মেদ
৩. সৈয়দ আবুল কাসেম
৪. সৈয়দ বেলায়েত হোসেন

বাস্তবিক পক্ষে দেখা গেছে সৈয়দ বংশের লোকজন গ্রামের অন্যান্য বংশের লোকদেরকে কখনই কোন কাজে ডাকে না। তাদের এই একচ্ছত্র নেতৃত্বের কারণেই ২০১১ সালের নির্বাচনে প্রভাবশালী প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৈয়দ মনির আহমেদ এবং সৈয়দ বেলায়েত হোসেনদেরকে ১,৭০০ ভোটে পরাজিত করে কাজী সবুজ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কাজী সবুজের নির্বাচিত হওয়ার নেপথ্যে যে বা যারা বিশেষ ভূমিকা রাখেন তারা হলেন, নিজ গ্রাম পশ্চিম কমলাপুরের কাজী গোষ্ঠী তৎসঙ্গ অন্যান্য গ্রামের অপেক্ষাকৃত কম সুবিধাভোগী জনগণ।

নিম্নে জ্ঞাতি ও গোষ্ঠী দ্বারা বিচারিক প্রক্রিয়ার কয়েকটি কেস স্টাডি উল্লেখ করা হলো।

৩ নং কেস

ডাসার ইউনিয়নের পশ্চিম পার্শ্বে লাগোয়া নবগ্রাম ইউনিয়নের একটি গ্রাম শশিকর। শশিকর ১নং ওয়ার্ডের শিকারী বাড়ি লক্ষিকান্ত বিশ্বাসের মেয়ে সুপ্রিয়া বিশ্বাস কলেজ থেকে ফেরার পথে ডাসার ইউনিয়নের আড়ুয়াকান্দি গ্রামের গুরুদাস বেপারীর ছেলে অশোক হঠাৎ করেই সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। পূর্বে পাশাপাশি গ্রামের হওয়ায় কলেজ থেকে ফেরার পথে প্রায়ই বিভিন্ন টিটকারীমূলক কথা বলত। কিন্তু সেদিন হঠাৎ করেই সামনে এসে দাঁড়ায় এবং পথ রোধ করে মেয়েটিকে বিয়ে করার কথা বলে। মেয়েটি ভয়ে পুকুরের পাড় দিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে দৌড় দেয় এবং কাঁদার মধ্যে পড়ে যায়। সেই অবস্থাতেও ছেলেটি পুনরায় তাকে ধাওয়া দেয় এবং মেয়েটি অনেক জোড়ে দৌড়ে গিয়ে বাড়ির উঠানে এসে জ্ঞান হারা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মেয়েটিকে একটু সুস্থ করা হলে মেয়ের মা আড়ুয়াকান্দি যায় এবং ছেলের কাকা ক্ষুদিরাম সিংহ ও দিলীপ সিংহের কাছে নালিশ করে ন্যায় বিচার চায়। মেয়ের মা নিজ গ্রাম শশিকরে এসে তাদের নিজ ওয়ার্ডের মেম্বার দিলীপ বিশ্বাসের কাছে সমস্ত ঘটনা বলে। মেয়ের বাবা শারীরিকভাবে দুর্বল বিধায় কারো কাছে যেতে পারে না। দিলীপ মেম্বার সম্পর্কে মেয়ের কাকা হয়। ঘটনা শুনে তার আত্মসম্মানে লাগে। সে তখনি এলাকার কিছু যুবক ছেলেদের নিয়ে আড়ুয়াকান্দি ছেলের বাড়িতে ছুটে যায় এবং ছেলেটিকে সামনে আসার

জন্য ডাকা হয়। যুবক ছেলেরা ছেলেটিকে সামনে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিছু মারধর করে এবং তার এই অসম্মানজনক কাজের জন্য এক লাখ টাকা জরিমানা করে। মেম্বার দিলীপ বিশ্বাস যুবকদের থামিয়ে দিয়ে সালিশ ডাকার কথা বলেন এবং ছেলের পক্ষের ৩য় ব্যক্তি কৃষ্ণ দাসকে সালিশে এসে মেয়ের মানহানিকর অবস্থার সুবিচার চান। এ দিনই সালিশের দিন ধার্য করা হয়। ঐ সপ্তাহেরই শেষের দিন ছিল বৃহস্পতিবার। হিন্দু ধর্মীয় মতে পূণ্যদিন। বৃহস্পতিবার বিকেলে মেয়ের গ্রামে অবস্থিত বাবুরামের মন্দিরে সালিশ ধার্য্য করা হয়। বিকেল হতেই এলাকার যুবক ছেলেরা আসতে থাকে। ছেলের পক্ষ থেকে ক্ষুদিরাম সিংহ, দিলীপ সিংহ, বিমল সিংহ ছেলের বাবা মা এরা অনেকেই আসেন। অনেক লোকের মধ্য থেকেই প্রস্তাব আসে সালিশ কার্যক্রম পরিচালনা করার কমিটি গঠন করার জন্য। অবশেষে দিলীপ মেম্বারের সহযোগিতায় ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাদের মধ্যে ৭ জনের পক্ষে যেদিকে মতামত প্রদান করা হবে সেটিই সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেয়া হবে। উভয়ের পক্ষ থেকে মতামত আসে দিলীপ বিশ্বাসকে সভাপতি করার জন্য এবং অবশেষে তাই করা হয়। দিলীপ বিশ্বাসকে সভাপতি করা হলে যুবক ছেলেরা এক লাখ টাকা জরিমানা করার কথা বলে না হলে ছেলের নামে মানহানির মামলা করা হবে। সেই সময় ছেলের বাবা-মা, ভাই-বোন, নিকট আত্মীয় যারা ছিলেন তারা সবাই সভাপতির হাত-পা ধরে কান্নাকাটি করে। আমরা গরীব মানুষ। এত টাকা জরিমানা করলে পরিশোধ করা কষ্টকর হবে। অনেক অনুরোধের পর জরিমানার পরিমাণ কমিয়ে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকায় আনা হয় এবং ৩০০/- টাকার স্ট্যাম্পে সিদ্ধান্ত লিখিত হয়। যে মন্দিরে বসে বিচারকার্য করা হয় সেই সময় মন্দিরের সংস্থার কাজ চলছিল। পুরোহিতকে সাক্ষী রেখে স্ট্যাম্পে

লিখিত হয় এবং মন্দিরের সংস্কার কাজের জন্য ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ছেলের পক্ষকে দিতে বলা হয়। সেই সাথে সাথেই ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা দেওয়া হয় এবং পরবর্তী পনের দিনের মধ্যেই সভাপতির উপস্থিতিতে ছেলের পক্ষ থেকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মেয়ের মায়ের হাতে দেওয়া হয়।

৪ নং কেস

ডাসার ইউনিয়নের আর একটি গ্রাম পশ্চিমে কমলাপুর। পিতা তাহের হাওলাদার। তার পালিত মেয়ে চেহারুন। তাহের হাওলাদারের ছেলে হানিফ হাওলাদার। পিতা তাহের হাওলাদারের কোন কন্যা সন্তান ছিল না। স্নেহের বশত: চেহারুনকে কোলে থাকা অবস্থায় তার মায়ের কাছে থেকে নিয়ে এসে তার ঘরে লালন পালন করে। চেহারুন বড় হয়। তাহের হাওলাদার নিজে পিতার পরিচয় দিয়ে বিয়ে দেন। হানিফ হাওলাদারকে জমি রেজিস্ট্রেশন করার সময় মেয়ের ঘরটিতে চেহারুনের নাম লিখে। চেহারুন কখনও তাহের হাওলাদারকে নিজের পিতা ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না। ২০১০ সালে তাহের হাওলাদার মারা যায়। মৃত্যুর পরে হানিফের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। সেই সময় চেহারুন এবং তার স্বামী নজিবুর হানিফকে টাকা-পয়সা দেয় সংসার চালানোর জন্য। সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে। নজিবুর হার্ট এ্যাট্যাক করে মারা যায়। চেহারুন একা হয়ে পড়ে। তার একমাত্র চার বছরের মেয়েকে নিয়ে সে এখন আর কাজ করতে পারে না। নিরুপায় হয়ে ভাই হানিফের ঘরে আসে। হানিফের স্ত্রী প্রথমেই বাধ সাধে যাতে চেহারুন তাদের ঘরে আশ্রয় না নেয়। চেহারুন নিরুপায় হয়ে পড়ে। ভাই-

হানিফের কাছে খুব অনুরোধ করে বারান্দায় কোনরকমে নিজের স্থানটুকু করে নেয়। কিন্তু দুই দিন যেতে না যেতেই হানিফের স্ত্রী ঘর থেকে বের করে দেয়। তখন ছিল বর্ষাকাল। চার বছরের মেয়েকে নিয়ে উঠানে ভিজে দাড়িয়ে থাকে। অন্যান্য ঘরের চাচীরা ডেকে নেয় এবং তারা বুদ্ধি দেয় গ্রামের মাতবরকে তার এই অবস্থা জানানোর জন্য। চেহারুন ডাসার ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের মেম্বার গোলাম মওলাকে সব ঘটনা খুলে বলে। গোলাম মওলা ২/৩ বার গিয়ে চেহারুনকে বারান্দায় বসিয়ে দিয়ে আসে। চেহারুন ভাই হানিফকে অনুরোধ করে বলে মাত্র আড়াই হাত জায়গায় আমরা দুজন থাকতে পারিনা। আমাদেরকে উঠানের একপার্শ্বে একটা ছোট্ট চালা ঘর করে দাও। এই কথা বলাতে ভাই হানিফ এবং তার স্ত্রী চেহারুনকে টেনে হিচড়ে বাইরে ফেলে দেয়। চেহারুন উপায়ন্তর না পেয়ে তাদের গ্রামের পার্শ্বের গ্রামে মাদারীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশনের অফিসে যায় এবং সেখানের ফিল্ড সুপারভাইজার মোর্শেদা বেগমকে সবকথা খুলে বলে। মোর্শেদা বেগম তার আইনি প্রক্রিয়ায় কেস হিসট্রি লিখে ফেলে এবং নগদ টাকা পাওনাসহ ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকার কেস দেয়। মোর্শেদা বেগম তার অফিসের নিয়ম অনুযায়ী ১নং ওয়ার্ডের মেম্বার গোলাম মওলাকে সব তথ্য জানায় এবং সে হানিফকে ডেকে বলে যে, আমাদের গ্রামের মুরব্বি এবং বয়োজেষ্ঠ যারা আছে তাদের সঙ্গে তোমাকে বসতে হবে, না হলে ভয়ানক বিপদ হয়ে যাবে।

১৪/০৬/২০১৩ সকাল ১০ টার সময় গোলাম মওলার নেতৃত্বে তাদের এলাকার সবচেয়ে বয়োজেষ্ঠ দেলোয়ার হোসেন হাওলাদার বয়স ৯০ বছর, টিটো কাজী যার বয়স ৪৫ বছর (বি.এ পাশ), আরজ আলী হাওলাদার, বয়স ৪৫, হারুন হাওলাদার, বয়স ৫০, মাজেদ হাওলাদার, বয়স ৬০, ইদ্রিস হাওলাদার সবাই এলাকার সম্পর্কে জ্ঞাতি ভাই

হয়। সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি দেলোয়ার হোসেনকে সভাপতি করে সালিশ কার্যক্রম পর্যায়ে শুরু হয়। গ্রামের অন্যান্য যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তি দিয়ে প্রায় ৫০, ৬০ জনের মত উপস্থিত ছিল। গোলাম মওলা থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক ব্যক্তিরা হানিফকে বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে কিছুতে বুঝ মানতে চায়না। এমনকি চেহারুনের পালনকর্তা মাও তার বিরুদ্ধে চলে যায় এবং বলে যে, চেহারুন শেষ পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে কেস দিতে গিয়েছে অতএব তাকে আর আমরা রাখব না। তারা কোনভাবেই সালিশ মানতে রাজী হয় না। শেষ পর্যন্ত সভাপতি সাহেব হানিফকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, তোমাকে আমরা বহুবার সংশোধনের জন্য বলেছি, কিন্তু তোমাকে কোনভাবেই সংশোধন করা গেল না। এখন আর কি করতে পারা যায়। সারাদিন বসেও যখন তারা সমাধান দিতে পারেনি তখন পরের দিন আবার বসার কথা বলে সমাধান দেয়। পরের দিন পুনরায় একই যায়গায় বসা হয়। সভাপতি সাহেব বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তি ৯০ বছর বয়স। সে বারে বারে বলতে থাকে আমাদের এলাকার মন্ত্রী মহোদয় পর্যন্ত আমার কথা শুনে। তুমি কেন শুনবেনা, গোলাম মওলা এবং অন্যান্য বয়োজেষ্ঠ যারা ছিল তারা সবাই ভাই-বোনের সম্পর্ক মিলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। অনেক পীড়াপিড়ির পর হাতে হাত মিলিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা পাশাপাশি বসে। চেহারুনের আপন ভাই ইদ্রিস হাওলাদার অনেক কান্নাকাটি করে। আমাদের আপন বোন কিন্তু কোনদিন আমাদের ঘরে সে আসেনি। হানিফ হাওলাদারকে ভাই বলে জানে এবং সেখানে সে থাকতে চায়। শেষ পর্যায়ে পরিবেশ শান্ত হলে ১নং ওয়ার্ডের মেম্বার গোলাম মওলা হানিফ হাওলাদারের কাছে চার হাত জায়গা চায় এবং যেখানে চেহারুন তার মেয়েকে নিয়ে চালাঘর উঠিয়ে থাকবে।

সেই সিদ্ধান্তই হয় এবং হানিফ হাওলাদার মুরব্বিদের কথা দেয় আপনাদের আর কোন দিন আসতে হবেনা। ওখানেই সমাপ্তি হয়।

উপসংহার ঃ সবশেষে, অবনায়ন বা পরিবর্তনের সূচনা যে অবস্থাতেই হোক জ্ঞাতি সম্পর্ক গ্রামীন সমাজে জনসাধারণের ঐক্য (integration) এবং সংগঠনের (organization) অন্যতম উৎস (source) বা প্রক্রিয়া (process) বলে গণ্য। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে (sectors) যেমন, সামাজিকীকরণ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রভৃতি জ্ঞাতিদের বা জ্ঞাতি সম্প্রদায়ের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর কোন অংশ যেমন ব্যক্তির সামাজিকীকরণ, উৎপাদন সংগঠন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা, আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন ইত্যাদিতে জ্ঞাতিদের ভূমিকা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয় বরং অপরিহার্য (crucial)। তবে এটাও বলা সমীচীন নয় যে, জ্ঞাতি সম্পর্ক নিরবিচ্ছিন্নতা বা অনাবিল ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। এতে ঝগড়া-বিবাদ, দ্বন্দ্ব বা অনৈক্য ও অসংহতির উপাদানও পাশাপাশি বিদ্যমান।

৬. ঘ. মাতব্বর শ্রেণীর ভূমিকা

সমাজে সমাজপতিদেরকে বলা হয় মাতব্বর। মাতব্বররা সাধারণত বয়সের দিক থেকে চল্লিশোর্ধ, সম্মানিত, জ্ঞানী ব্যক্তি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল। বিভিন্ন অঞ্চলে এদেরকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়। কোথাও সমাজ প্রধান বা প্রধান, কোথাও সর্দার, কোথাও প্রামাণিক, কোথাও মন্ডল, কোথাও আবার মাতব্বর বা মাত্বর নামেও পরিচিত।

A. H. M. Zehadul Karim তাঁর the pattern of Rural Leadership in an Agrarian society বইটিতে উল্লেখ করেছেন যে- Leadership for over a century has been enacted through the institution of Samaj. Samaj is an informal organization within adjacent localities land rich persons from important gosthi (lincage) become the leaders of Samaj (Preface) (Karim, 1990:11).

বিগত একশত বছর যাবত নেতৃত্ব মূলত সমাজের মধ্যে আবদ্ধ। Power in the samaj is exercised by the pradhans (chiefs) and parmaniks (sub chiefs). The real political power of the pradhans and parmaniks is exercised in setting disputes between members of the samaj (Karim, 1990:12).

প্রধান এবং প্রামাণিকরা মূলত সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে বাধ্য থাকে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো।

1. Mediating conflicts among Samaj members (দ্বন্দ্ব নিরসনে সমাজে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে)।
2. Advising and negotiating marriages (বিবাহ সম্পর্কে উপদেশ এবং আলাপ-আলোচনা করে)।
3. Counselling litigants and often pleading cases in salish adalat (formal village court) (সালিশ আদালতের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে থাকে).
4. Advising villagers on candidates in local councils and national political forums (জাতীয় এবং আঞ্চলিক রাজনীতি সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে থাকে)।
5. Advising on religious and ritual affairs (ধর্মীয় উৎসবাদীর ক্ষেত্রে উপদেশ দিয়ে থাকে)।
6. Helping villagers obtain the financial means to pay for the furnerals (দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় গ্রামবাসীদেরকে সহায়তা করে থাকে)।
7. Offering sharecrops financies, lending moncy/grain and accepting land mortgages (জমি বন্ধকী, ধার-দেনা, ফসল কাটা এবং ফসল তোলা সম্পর্কিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে) (Karim, 1990:120).

সমাজের বিচার সালিশ ছাড়া সমাজের সর্বপ্রকার উন্নয়ন কাজের সঙ্গেও সমাজ প্রধান বা প্রামাণিকরা জড়িত থাকে। ইসলামিক মূল্যবোধ অনুযায়ী সমাজের প্রধানরা তাদের প্রতিবেশীকে নিয়ে সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রথম অবস্থায়ই একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সমাজ

প্রধানরা মসজিদ নির্মাণ দ্বারা অন্য সমাজ থেকে নিজেদের আত্মমর্জাদাবোধ এবং শক্তিশালী বলে মনে করেন। অনেক সময় অনেক প্রধানরা তাদের নিজেদের জমিও মসজিদের জন্য দান করে থাকেন। যার ফলে সমাজে তাদের নেতৃত্ব এবং উচ্চতর স্থান বৈধ হয়ে যায়। সমাজ প্রধানরা শুধু মসজিদ নির্মাণ করেই থাকেন না, মসজিদের খতিব নিয়োগেও তাদের প্রাধান্য থাকে। মসজিদের অন্যান্য সদস্যরা সাপ্তাহিক প্রার্থনা অনুষ্ঠান জুম্মার নামাজে অংশগ্রহণ করেছে কিনা, রমজান মাসে নিয়মিত রোজা রাখছে কিনা তাও খেয়াল রাখেন। কোন সদস্য যদি নিয়মিত মসজিদে না আসে এবং রোজা না রাখে তার জন্য তাকে শাস্তিস্বরূপ অর্থনৈতিক কাফফারা দিতে হয় অথবা শারীরিক শাস্তিও পেয়ে থাকে। ধর্মীয় মূল্যবোধকে ভঙ্গ করলে অনেক সদস্যদেরকে এক ঘরে করে রাখা হয়। সমাজের অন্য সদস্যরা আটককৃত ঐ পরিবারকে খাবার পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে সাহায্য করে না। ঐ পরিবারকে কোন দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। তাদের শিশুদেরকে অন্য শিশুদের সাথে মিশতে দেয়া হয় না। জমির কোন কাজে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না।

সমাজপ্রধান বা প্রামাণিকরা যে উপায়ে সমাজের বিচারকার্য সমাধান করেন তাকে মোট দুটি পদ্ধতিতে ভাগ করা যায়।

a) bicar (Intra-Samaj meeting for resolving conflicts) (সমাজের অভ্যন্তরীণ বিচার ব্যবস্থা)।
b) dighor salish (an inter samaj and inter-village meeting for resolving conflicts) (দুই বা ততোধিক বৃহত্তর সমাজের বিচার ব্যবস্থা)।

কোন একটা গোষ্ঠী বা কোন একটা সমাজের সম্মান রক্ষা করার জন্যই প্রধান এবং প্রামাণিক দ্বারা বিচারকার্য পরিচালিত হয়। কিন্তু দীঘর সালিশের ক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজ এবং গোটা গ্রামকে নিয়েই প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সালিশ আদালত গঠন করে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। মাঠ পর্যায়ে গবেষণার সময় আমি ডাসার ইউনিয়ন তথা ডাসার ইউনিয়নের বাইরে গিয়ে কোটালিপাড়া ইউনিয়নেও অনেকগুলো বিচার কার্যে অংশগ্রহণ করেছি।

৫ নং কেস

ডাসার ইউনিয়নের পাশেই নবগ্রাম ইউনিয়ন। যার কিছু অংশ ডাসার ইউনিয়নের মধ্যে পড়েছে। নবগ্রাম ইউনিয়নের একটি গ্রাম শশিকর গ্রাম। শশিকর গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার নাম লস্কর পুকুর পাড়। লস্কর পুকুর পাড়ের বিশ্বাস বাড়িতে বিষ্ণু বিশ্বাস তার কাকার ২০ শতাংশ জায়গা পশ্চিম শশিকরের বাদল সরকারের কাছে বিক্রি করবে বলে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা বায়না নেয়। দুজনই সম্পর্কে আত্মীয় হয়। আত্মীয়তার বিশ্বাসের কারণে মুখে মুখেই জমির দাম ধরা হয়। বিষ্ণু বিশ্বাস ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা জমির মূল্য ধরেন। বাদল সরকার ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা হিসেবে জমির মূল্য ধরেন। কিন্তু বিষ্ণু বিশ্বাস রাজী না হওয়ায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রামের ২ নং ওয়ার্ড মেম্বার মৃনাল সরকার। তাকে সমাজে সবাই মান্যগন্য করেন। মৃনাল সরকার ঐ জমির মূল্য ধরে দেন ৬৫,০০০/- (পঁয়ষট্টি হাজার)

টাকা। বিষ্ণু বিশ্বাস রাজী হয়ে যান। দিন ধার্য করে মৃনাল বিশ্বাসকে নিয়ে দুজনেই রেজিস্ট্রি অফিসে যান। পূর্বের দলিলপত্র ঘেটে দেখা যায় জমির পরিমান R/S রেকর্ডে আছে ১৫ শতাংশ কিন্তু দলিলে আছে ২০ শতাংশ। রেজিস্ট্রি অফিসেই বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে মৃনাল সরকার রেজিস্ট্রার সাবকে বুঝিয়ে R/S রেকর্ডকে বাদ দিয়ে পুরনো দলিল অনুযায়ী ২০ শতাংশ জমিই নতুন করে রেকর্ড করিয়ে নিয়ে আসে। দু'জনের মনোমালিন্য শেষ হয় না। বাদল সরকার R/S রেকর্ডের ১৫ শতাংশের মূল্য পরিশোধ করতে চায়। কিন্তু বিষ্ণু বিশ্বাস তাতে রাজী হয় না। সে কারণে জমির মূল্য পরিশোধ করা হচ্ছে না। উপায়ন্তর না দেখে মৃনাল সরকার গ্রামের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং তার আত্মীয় নিলু সরকার ও বাদল সরকারের বড় ভাই পরিতোষ সরকারকে ডাকা হয়। জমির পরিমান কমবেশি নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক ভুল বুঝাবুঝি হয়। প্রাক্তন চেয়ারম্যান, মৃনাল সরকার এবং নিলু সরকার উভয় পক্ষের কথা শোনেন এবং তারা বলেন আমাদের এই সভায় যদি জমির একটা মূল্য ধরে দেওয়া হয় তাহলে তোমরা মানবে কিনা। উভয় পক্ষের শিকারোক্তির পরে জমির মূল্য রেজিস্ট্রি এবং বায়নাপত্রসহ ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকায় ধার্য করে দেওয়া হয় এবং টাকা লেনদেনের দিনও ধার্য করে দেওয়া হয়। উপস্থিত বাদল সরকারের বড় ভাই পরিতোষ সরকার সভায় জয়ধ্বনি দিয়ে সভা শেষ করেন। এই বিচারকার্যকে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ তাই একে বিচার সভা বলা যায়।

কিন্তু শশিকর গ্রামের উত্তর পাড়ার একটি ছেলে কোটালিপাড়া ভাঙ্গার হাট ইউনিয়নের একটি মেয়ের প্রণয়কে কেন্দ্র করে নবগ্রাম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, এলাকার গন্যমান্য

ব্যক্তি, যুবক দল, ছেলের আত্মীয়-স্বজন মিলে ভাঙ্গার হাট ইউনিয়নে গিয়ে মেয়েটির আত্মীয়-স্বজন, উপজেলা চেয়ারম্যান, কোটালিপাড়া আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে যে বিচারকার্য হয়েছিল তাকে দীঘর বিচার বলে গন্য করা যায়।

Since Independence in 1971, there has been a proliferation of government programmes targeted at Bangladesh rural communities. These new programmes, including cooperatives, work incentive programmes and social welfare units. Provide new opportunities for villagers to exercise power in the community. Infact the leaders in these programmes come from the politically powerful samaj. While there is a change in the actual leaders, who are now the educated sons of the pradhan and parmaniks of the traditionally powerful samajs; the control of power is even more concentrated in the hends of the old clity (Karim, 1990: 122).

সমাজের যেকোনো ধরনের অসদারচন, ঝগড়াঝাটি বিভিন্ন ধরনের কোন্দল সমাজপতিরাই মীমাংসা করে থাকে। তারা সাধারণত বিচারের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ এবং ভারসাম্যমূলক হয় এবং পক্ষসমূহ হতে ঘুষ নিতেও অনিচ্ছুক থাকে। মাতব্বরদের পদ প্রায় ক্ষেত্রেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

ডাসার ইউনিয়নের মাতব্বর উপাধি পাওয়ার নমুনা ছকের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

উত্তরাধিকার সূত্রে মাতব্বর

	নাম	বয়স	শিক্ষাগত	পেশা	সম্পর্ক	জমির পরিমাণ

			যোগ্যতা			
১।	সৈয়দ কামারুজ্জামান	৭০	এস.এস.সি	কৃষি	বাবা	৮০০ শতাংশ
২।	সৈয়দ মনির আহম্মেদ	৫৫	এইচ.এস.সি	ব্যবসা	ছেলে	৩২০ শতাংশ
৩।	সৈয়দ লাল মিঞা	৭৫	পঞ্চম শ্রেণী	কৃষি	বাবা	৪০০ শতাংশ
৪।	সৈয়দ আজিম উদ্দিন	৪০	পঞ্চম শ্রেণী	কৃষি	ছেলে	৩০০ শতাংশ
৫।	সৈয়দ ওহিদ মিয়া	৬০	পঞ্চম শ্রেণী	কৃষি	বাবা	১৬০ শতাংশ
৬।	সৈয়দ বশার মিঞা	৩৫	পঞ্চশ শ্রেণী	কৃষি	ছেলে	১২০ শতাংশ

বেতবাড়ি গ্রামের মাতব্বর শ্রেণী

	নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	জমির পরিমাণ
১।	মফিজুল হক সরদার	৬৫	পঞ্চম শ্রেণী	মেম্বার	৯৬০ শতাংশ
২।	জহিরুল ইসলাম	৫৫	এইচ.এস.সি	চাকুরী	১৬০ শতাংশ
৩।	জাহিদুল ইসলাম	৪৫	পঞ্চম শ্রেণী	ব্যবসা	১২৮০ শতাংশ
৪।	মালেক শরিফ	৬০	এস.এস.সি	মুক্তিযোদ্ধা	১২৮০ শতাংশ

কমলাপুর গ্রামের গোষ্ঠী ভিত্তিক মাতব্বর শ্রেণী

	নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	জমির পরিমাণ
১।	মোঃ এসকান্দার মাতুব্বর	৬৫	৮ম শ্রেণী	কৃষি	৫০০ শতাংশ
২।	মোঃ ছরোয়ার মাতুব্বার	৫৮	৯ম শ্রেণী	কৃষি	৪০০ শতাংশ
৩।	মোঃ বজলু মাতুব্বর	৫০	৮ম শ্রেণী	কৃষি	১৪০ শতাংশ

৪।	মোঃ হারুন মাতুব্বর	৫৫	৭ম শ্রেণী	কৃষি	২০০ শতাংশ
৫।	মোঃ আব্দুল হাই মাতুব্বর	৬৫	৪র্থ শ্রেণী	কৃষি	৩০০ শতাংশ
৬।	মোঃ নেছার উদ্দিন মাতুব্বর	৭৫	৮ম শ্রেণী	কৃষি	২৫০ শতাংশ
৭।	মোঃ রহমান মাতুব্বর	৫০	এস.এস.সি	কৃষি	১২০ শতাংশ
৮।	মোঃ ফারুক মাতুব্বর	৫০	এস.এস.সি	ব্যবসা	১৮০ শতাংশ
৯।	মোঃ হান্নান মাতুব্বর	৪০	৮ম শ্রেণী	ব্যবসা	৫০০ শতাংশ

বংশ মর্যাদাসম্পন্ন

	নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	জমির পরিমাণ
১।	মোঃ ছালাম	৬৫	এস.এস.সি	কৃষি	১৫০০ শতাংশ

২।	কাঞ্চন তালুকদার	৪৫	এইচ.এস.সি	চাকুরী	১২০০ শতাংশ
৩।	কাজী ইসমাইল	৫৫	এইচ.এস.সি	চাকুরী	১৩০০ শতাংশ
৪।	দেলোয়ার হোসেন তালুকদার	৬০	বি.এ	চাকুরী	১৮০০ শতাংশ
৫।	মোঃ মজিদ তালুকদার	৬৫	পঞ্চম শ্রেণি	কৃষি	১৩৩০ শতাংশ
৬।	মোঃ মনির তালুকদার	৭০	৮ম শ্রেণী	কৃষি	১৪০০ শতাংশ

উপরোক্ত তালিকায় যেসব মাতব্বরের নাম উল্লেখ করা হল তারাই মূলত প্রধান মাতব্বর। তাদের সহযোগিতা করে থাকেন এমন মাতব্বরের সংখ্যাও অনেক। ডাসার গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন, শিক্ষাগত উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা এবং পারিবারিক সমস্যা সমাধানে এরাই মুখ্য ভূমিকা রাখেন।

৬. ঙ. গ্রাম সমিতি

গ্রাম সমিতি ঃ গ্রাম সমিতি ডাসার ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। ডাসার ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে, প্রত্যেক পাড়ায়

পাড়ায় সমিতি আছে। সমিতিগুলোতে যেমন পুরুষ, যুবক শ্রেণী আছে তেমনি মহিলারাও অংশ গ্রহণ করে। এনজিওগুলোর মধ্যে প্রশিকা, আশা, ব্রাক, টিপি, কারিতাস, ডাচবাংলা, ওয়ার্ল্ডভিশন, সমবায় সমিতি, গ্রামীণ ব্যাংক, চাঁদের আলো, কো-অপারেটিভ, প্রভৃতির নামকরা যেতে পারে। এই এনজিওগুলোর প্রতেক্যেরই ছোট ছোট সমিতি থাকে। এই সমিতির একজন করে সভাপতি থাকেন, যিনি সমিতি পরিচালনা করেন। অধিকাংশ সময়ই এই সমিতিগুলোর সভাপতি থাকেন পাড়ার ছোট খাট মাতব্বর, অথবা আর্থিকভাবে যার সচ্ছলতা আছে অথবা যিনি লেখাপড়া বা জ্ঞানেগুণে অন্যান্য সদস্যদের মধ্য থেকে একটু বেশি জানেন। কোনো পাড়ায় পুকুর কাটা, খালকাটা, রাস্তা বাঁধা বিল্ডিং এর ছাদ পিটানো প্রভৃতি কাজে তেমনিভাবে যুবক শ্রেণী অংশগ্রহণ করছে তেমনি মহিলারাও অংশগ্রহণ করছে। এদের পারিশ্রমিকের পাওনা মালিক দিয়ে থাকে তাদের সমিতির প্রধান (সভাপতি) কে। সে সবাইকে ডেকে এনে এক জায়গায় বসে তাদের পাওনা ভাগ করে দেয়। পরবর্তীতে পুনরায় যদি কোনো কাজ আসে তাহলে মালিকগণ ঐ সভাপতিকে প্রথমে জানায়। সভাপতিই ঠিক করে কাকে কাজ দেয়া হবে আর কাকে দেয়া হবেনা। সমিতিগুলো ঐ সভাপতির নেতৃত্বে প্রতি সপ্তাহে কোনো একদিন সদস্যের বাড়িতে মিলিত হন। সেখানে তারা নিজেদের পরিবারের সুখ দুঃখের কথা বলেন। তাদের পারিশ্রমিক থেকে ১০ টাকা অথবা ৫ টাকা করে চাঁদা আদায় করেন। সেই চাঁদা দিয়ে তারা কোনো পরিবারের মেয়ের বিয়ে, কারো ছেলে অসুস্থ হলে চিকিৎসা ব্যবস্থা, কারো ঝড়ে ঘর পড়ে গেলে তারা সবাই মিলে ঘরে বেড়া করে দেয়া এই ধরনের সামাজিক

কাজকর্মগুলোর সমাধান দিয়ে থাকে সম্মিলিত ভাবে। বেশ কয়েক বৎসর যাবত বিদেশী সাহায্য সংস্থাগুলো গরীবদের মাঝে লোন দেয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিক্ষা সচেতনতামূলক কার্যক্রমগুলো তাদের কাছে পৌছে দেয়ায় গ্রামের ঐ সমিতিগুলো যেন প্রাণ পেয়ে উঠেছে। শিশুদের লেখাপড়ার জন্য কাগজপত্র খাতা কলম দেয়া, গৃহিনীদের ঘরের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন বালতি, মগ, শীত আসলে লেপ, কম্বল প্রভৃতি জিনিস দিয়ে থাকে। ওয়ার্ল্ডভিশন নামক সংস্থাটি শিশুদের পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য গ্রামে গ্রামে গিয়ে মায়েদের সুষমখাদ্য রান্না শিখানো শিশুদের খাওয়ানো তাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য অন্যান্য শিক্ষা দিয়ে থাকে।

লিগাল এইড এসোসিয়েশনের যে কার্যক্রম যেমন সালিশ কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হলে সাধারণ জনগণ ন্যায় বিচার পাবে, কিভাবে গ্রাম আদালত গঠন করা যায়, কিভাবে পারিবারিক সমস্যার সমাধান করা যায়, কিভাবে খোরপোশ আদায় করা যায়, কিভাবে যৌতুক প্রথা বন্ধ করা যায় কিভাবে শিশুশ্রম বন্ধ করা যায়, জমিজমা সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব কিভাবে মিমাংসা করা যাবে, বিবাহ সম্পর্কিত আইন, দেনমোহর কিভাবে আদায় করা যায়, মুসলিম বিবাহ ও তালাক, রেজিস্ট্রেশন, হিন্দু বিবাহ এইসব বিষয় সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করা এবং পরবর্তীতে আবার এলাকার কোন মহিলা সমস্যায় না পড়ে সে সম্পর্কে সচেতন করা, আদালতে গেলে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, সঠিক ন্যায় বিচার পাবে কিনা সময় এবং টাকা পয়সার সমস্যায় পড়বে কিনা,

তুলনামূলকভাবে গ্রামীণ সালিশ কার্যক্রম তাদের জন্য কতোটা উপযোগী এইসব বিষয় তাদের কাছে তুলে ধরেন এবং সাধারণ জনগণকে সচেতন করে তোলেন। অসহায় নারীরা, স্বল্প সময়ে, অর্থ খরচ না করে সহজে সঠিক বিচার পায়।

মাদারীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশনের একজন ইউনিয়ন অর্গানাইজার জনাব সৈয়দা মুর্শিদা আক্তার, বাড়ি ডাসার গ্রামে। তার প্রধান কাজই হচ্ছে গ্রামে উঠান সভার মাধ্যমে মহিলাদের মাঝে তাদের সামাজিক পারিবারিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। ডাসার ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে CBO (Community Based Organizer) এবং ও কেন্দ্রীয় ওয়ার্ড কমিটি (আইন সালিশ সম্পর্কিত) সদস্য আছে। নারী পুরুষ উভয় মিলে ১২ হতে ১৭ জন সদস্য নিয়ে ১টি সমিতি গঠিত হয় এবং প্রতি সপ্তাহেই ঐ সমিতিগুলোর সভা আলোচিত হয়। লিগাল এইড এসোসিয়েশনের যে কার্যক্রম যেমন- সালিশ সম্পর্কিত আলোচনা, সালিশের গুনাবলী কি, সালিশের মাধ্যমে কিভাবে সাধারণ জনগণ ন্যায় বিচার পেতে পারে, এ প্রথাগত আইন আদালত থেকে আমাদের সামাজিক বিচার ব্যবস্থার (সালিশের মাধ্যমে বিচারের পার্থক্য কোথায়, কোন ধরনের আইন ব্যবস্থা আমাদের জন্য জরুরী, মুসলিম আইনে বিবাহ, দেনমোহর, অভিভাবকত্ব, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বন্ধ, শিশুশ্রম বেআইনী, বাল্যবিবাহ অপরাধ, মুসলিম বিবাহে তালাক, রেজিস্ট্রেশন, ভূমি আইন যেমন– বর্গা, খাজনা বন্ধক, খাস জমি অর্থাৎ ভুমি সংক্রান্ত বিরোধ মিমাংসায় যা জানা প্রয়োজন তার সবটাই শিক্ষা দিয়ে থাকেন। হিন্দু আইনে বিবাহ ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার, দত্তক, শ্রীধন, দান,

উইল প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। গ্রাম আদালত গঠন, এখতিয়ার বিচার্য বিষয় বিচারযোগ্য ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা গ্রহণ, বিচার প্রক্রিয়া, মামলা খারিজ স্থানান্তর ও সাক্ষদান রায় প্রদান সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নকল সরবরাহ, ডিক্রী প্রস্তুত, আপীল, রায় বাস্তবায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

৬. চ. ক্লাব কমিটি, যুবক শ্রেনী, দুর্মুজ কমিটি

ডাসার ইউনিয়নে তিনটি ক্লাব কমিটি আছে। (১) দর্শনা যুবসংঘ, (২) পূর্ব কমলাপুর যুব সংঘ ও (৩) ডাসার যুবসংঘ। গ্রামের শান্তি শৃংখলা রক্ষা করার দায়িত্ব মূলত ইউনিয়ন পরিষদের। চৌকিদার, দফাদার আনসার এদের মাধ্যমেই গ্রামের শৃংখলা রক্ষা করা হয়। সংঘসমূহ রাতে গ্রাম পাহাড়া দেওয়া, গ্রামের সাঁকো নির্মাণ, রাস্তাঘাট ঠিক করা গাছপালা লাগানো প্রভৃতি কাজ করে। গ্রামের চেয়ারম্যান মেম্বারের পাশাপাশি সরকারি পর্যায় ছাড়া আরো যারা উন্নয়নমূলক কাজের সাথে জড়িত থাকে তারা হলো আমাদের যুবশ্রেণী বা যুবকদল। প্রথমত তারা যখন ক্লাব কমিটি গঠন করে তখন মূলত তাদের নিজেদের মধ্যে খেলাধুলা গানবাজনা পাঠাগার গড়ে তোলা এইসব উদ্দেশ্যেই করে থাকে। পরবর্তীতে সমাজের প্রয়োজনে নিজেদের মাবোনদের মানসম্মান রক্ষা, নিজের গ্রামকে রক্ষা, দুঃস্থ অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানো সমস্ত কাজে ঝাপিয়ে পড়ে। পূর্বে এই যুবসমাজ ছিল খুবই সুসংগঠিত কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক কার্যকলাপ গ্রাম থেকে

গ্রামে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে যে তাদের সেই পাঠাগার, খেলার মাঠ, দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ানো যেন তারা হারিয়েই ফেলেছে। সকাল সন্ধ্যা ডিশ, স্যাটেলাইট, টেলিভিশন, ডিজিটাল ক্যামেরা আধুনিক মোবাইল প্রভৃতি নিয়েই ব্যস্ত। তবুও যখন ডাসার যুবসংঘের এক সদস্য জনাব মাসুম আক্তারকে এই যুবসংঘের কার্যক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তখন সে নির্দ্ধিধায় উত্তর দেয় এই যুবসংঘের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে টাকা তুলে সমবায় সমিতি গঠন করে, তারা দুঃস্থ মহিলাদেরকে লোন দেয়, ঈদ আসলে শাড়ি দেয়- এই ধরনের কার্যক্রম করে।

UN Secretary General Kofi Annan যুবকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, æA society that cuts itself off from its youth severs its life line, it is condemned to bleed to death you are guardians of that life line, nurture it, develop it, give it strength" (Rowshan Ara, 2004: 117).

কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করে কফি আনান (Kofi Anan) আরো মন্তব্য করেন যে–

Youths are the major factors in determining the future of human society. They have a significant role to play in the process of social transformation. In 1989 youth workes from seven commonwealth countries of Asia region viewed æLeadership is dependent on

situations which have both political and social dimensions. It is providing guidance to youth in situations so that youth welfare work is successful. The guidance has to be given in correct ways. Leadership is channelising youth energy in one direction for progress and development of the country. Leadership must be functional. I must deliver the goods to beneficiaries. The leader must contribute to achievement. It is only the opportunities leader who should be carefully bandled"[2] (Rowshan Ara, A Philosophico – Social, Analysis of the Concept of Leadership with Special Reference to Youth Development in Bangladesh At the Gross-Root Level, P. 117, 2004).

দর্শনা যুবসংঘের সদস্য জনাব জাহিদ হাসান বলেন, আমাদের এই যুবসংঘের সদস্যরা ৫০০/১০০০ করে সদস্যদের মাঝ থেকে টাকা তোলে। তাদের প্রধান কাজই হচ্ছে গ্রামের সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানো। গ্রামের অসহায় লোকের সেবা দেয়ার জন্য তাকে হাসপাতালে নেয়া, কোন গরীবলোক মারা গেলে তার দাফন কাফনের কাজ করা, কোন গরীব দুঃখী মায়ের মেয়ের বিবাহ প্রদান, কারো ঘরে আগুন লেগে গেলে তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করা, ঝড়ে ঘড় ভেঙ্গে গেলে গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকদের কাছ থেকে টাকা তুলে কারো খেত থেকে বাঁশ নিয়ে, কারো বন থেকে গাছ কেটে ঘরবাড়ি তুলে নেয়া এই ধরনের সেবামূলক এবং উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।

আর সাক্ষাতকারের সবেচেয়ে বেশি চমকপ্রদ বিষয়টি হল- "তিনি উল্লেখ করেন যে, এই গ্রামের কোন দুঃস্থ বা অসহায় মেয়েকে যদি কেউ হয়রানী করতে চায়, নষ্ট করতে চায়, অপবাদ দেয় তাহলে সেইসব বিচারে সেই দুঃস্থ মেয়েটির পাশে দাঁড়ায়। তাকে যাতে অন্যায়ভাবে ঠকিয়ে না দেয় তার জন্য তারা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তেমনি ভাবে সমাজের অন্যান্য বিচার কার্যক্রমে সালিশে তারা উপস্থিত থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অন্যায়কারীর বিপক্ষে তারা সহাবস্থান নেয়। গ্রামের চেয়ারম্যান মেম্বারদেরকেও সহযোগিতা করে।

Youth Leadership সম্পর্কে UN World Congress এইভাবে মন্তব্য করেছেন, Rio to istanbut (1992-1996) highlights the urgent need of youth leadership in the development process. World Conferences reflect, æGovernments are slowly recognising that young people are experts in their own right, the best sources of knowledge and information about the needs and concerns of youth as well as very committed actors for social changes" (Rowshan, 2004: 119).[3]

সরকার গ্রামে যুবকদের সুসংগঠিত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছে। এর নাম পুলিশিং কমিটি। যুবকদেরকে মাঝে মাঝে গ্রামের বিশৃংখলা, সামাজিক অন্যায় রোধ করার জন্য ট্রেনিংও দিয়ে থাকে। প্রতিরোধ করার জন্য ট্রেনিং

দেওয়া হত। নাম দেওয়া হয়েছে পুলিশিং কমিটি। মূলত এই যুবকশ্রেণী প্রায় পুলিশের মতই ভূমিকা পালন করে। এই ইউনিয়নের প্রতি যদি কখনো বহিরাদের কর্তৃক হামলা হয়, যদি ডাকাত দুঃস্কৃতিকারী হামলা করে, কোন মেয়ে ছিনতাই হয়, কোন গুম, হত্যা মামলা প্রভৃতি হয় তাহলে তারা তা প্রতিহত করে।

বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে রাজনীতি এখন আর শহরকেন্দ্রিক নেই। গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। ডাসার ইউনিয়নে তিনটি রাজনৈতিক দল আছে। ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির। এই রাজনৈতিক দলগুলোর যেমন কোন স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যক্রম দেখা যায় না কিন্তু যখন জাতীয় রাজনীতি বা ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন আসে তখন তাদের ভূমিকা থাকে। ডাসার ইউনিয়নের যুবদলের রাজনৈতিক ভূমিকা খুবই গতিশীল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এই পর্যন্ত ডাসার ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় বংশ সৈয়দ বংশ হতে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে আসছিল কিন্তু গত স্থানীয় নির্বাচনে এলাকার কনিষ্ঠ প্রার্থী জনাব সবুজ কাজী (বয়স ৩০) কে নির্বাচিত করা হয়। যুবক দলের দাবী ছিল আমরা বহুবৎসর যাবত সৈয়দ বংশ দ্বারা নিপিড়ীত হয়ে আসছি। তারা বংশে, টাকা পয়সায় স্বচ্ছলতার কারণে যুগের পর যুগ তাদের পক্ষে লোকেরা কাজ করে আসছে। কিন্তু মনির চেয়ারম্যান গ্রামের কোন উন্নতি দেখাতে পারেনি। টাকা পয়সা লুটপাট, সরকার কর্তৃক সাহায্য কোনটিই গ্রামের সাধারণ জনগণের কাছে পৌছায় না। জনগণ ডাকলে তাকে পাওয়া যায়না। সেই কারণে আমরা এবারের নির্বাচনে যুবদলের প্রতিনিধি হিসেবে, সবুজ কাজীকে মনোনয়ন

দেই। নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে যুবকদল তাদের মনোনীত প্রার্থী সবুজ কাজীর বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ, সাধারণ জনগণের সেবামূলক, সমাজের ছোট বড় সবার প্রতি তার সম্মান ও ভালোবাসার কথা এমপি মহোদয়ের কাছে তুলে ধরেন। এমপি মহোদয় অনেক খুশি হয়ে তাকে একবার সিলেকশন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন।

৬. ছ. কাজী, মওলানা মুফতি, ইমাম ও পুরোহিতদের ভূমিকা

ইসলাম ধর্মের ি্বধান শুধু মুসলমানদের প্রতিই প্রযোজ্য। মুসলমানদের শাসনাধীন কোন রাজ্যের অমুসলমানদের প্রতি এই সকল বিধান প্রযোজ্য নয়। ইসলাম সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় ভাবে মুসলমানদের বিধান অনুযায়ী কাজি বিচার করতেন। বর্তমান যুগ আধুনিক যুগ। শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান বুদ্ধি সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিচার করার ক্ষমতা বেড়ে গেছে। পূর্বের তুলনায় সমাজের সাধারণ মানুষই তাদের অধিকার, কর্তব্য, ক্ষমতা, ন্যায়পরায়নতা, দেনা পাওনা সম্পর্কে অনেকবেশী সচেতন। হিন্দু সমাজে এক সময় ধর্মীয় গুরুকে স্বয়ং ভগবান মনে করা হত। ধর্মীয় শুরু যখন বলে দিত যে, একজন ছাত্র/শিষ্যের জ্ঞান পূর্ণ হয়েছে তখনই মূলত একজন ছাত্র/শিষ্য প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হতেন। উপনিষদেরও দেখা যায়- গুরুর সমীপে শিষ্যের জ্ঞান লাভ। ‘গু’ শব্দে অন্ধকার ‘র’ শব্দে নাশ। গুরু যিনি অন্ধকার করেন বিনাশ। আত্ম-জ্ঞান লাভ অতি কঠিন ব্যাপার। সেই

হেতু গুরু লাভ একান্তই দরকার। কাজেই সনাতন ধর্মে গুরুর প্রাধান্য ছিল একান্ত। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় কাজি মসজিদের ইমাম মওলানা এদের অনেক বড় ভূমিকা ছিল। পূর্বে ইসলামী শরিয়া মতে সমাজ ব্যবস্থার বিচার কার্য চালাত কিন্তু বর্তমানে আধুনিকতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আদালতের মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক আদালত প্রভৃতি গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে মস্‌জিদের ইমাম মওলানা পুরোহিতদের ভূমিকা কমে গেছে। তবুও পত্রিকা মারফত জানতে পারা যায় যে দেশের প্রচলিত আইনের বাইরে গিয়ে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে তারা বিভিন্ন সময়ে ফতোয়া দান করছে। ইসলামের ১ম যুগে আরবের নব্য প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় ফতোয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করলেও আজ কয়েক হাজার বছর পরে এই শব্দটি অত্যাচার, নিপীড়ন ও ত্রাসের প্রতিভু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফতোয়া আজ যারা চর্চা করে তাদের হাতে ধর্মের কল্যাণকর রূপটি বিকৃত হয়ে তা একটি কদর্য ও অশুভ নির্যাতনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ফতোয়া দেয়ার এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যে শুধু ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য তা নয়। রোমান সাম্রাজ্যে এমন ব্যবস্থা ছিল, খ্রিষ্টীয় যাজকতন্ত্রে ছিল, হিন্দু ধর্মেও ছিল। ইসলামের ইতিহাসের ১ম যুগে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মুফ্‌তির পদ সৃষ্টি করা হয়। তার দায়িত্ব থাকতো আইন সংক্রান্ত মীমাংসা দেয়ার আর বিচারের ভার ন্যস্ত থাকতো কাজির ওপর। এ যে মুফতির দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় কেবল ধর্মীয় প্রশ্নের মীমাংসা করা। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ফতোয়া দেয়ার আইনগত অধিকার কারোরই নেই। অথচ বাংলাদেশের যেকোন বিষয়ে ফতোয়া দেয়ার প্রবণতা ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে, এত ব্যাপক যে এসব ক্রিয়া

কলাপ সাধারণভাবে চিহ্নিত হচ্ছে ফতোয়া "বাজিস্ব হিসেবে"। এক ধরনের ফতোয়া দেয়া হচ্ছে যেকোন প্রগতিশীল কাজ ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নারীর বিরুদ্ধে। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য গ্রামের নিরক্ষর, দরিদ্র অসহায় বিরাট জনগোষ্ঠীকে হাতের মুঠোয় আটকে রাখতে মৌলবাদীদের শক্ত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ফতোয়া। প্রাচীন কাল থেকেই ফতোয়া দেয়ার প্রচলন ছিল। তবে তখন কেবল যাকাত বা এ সম্পর্কিত বিষয়ের ওপরই মতামত দেয়া হত। বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় কখনই ফতোয়াকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। বিশেষ করে যেসব ফতোয়া মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো লঙ্ঘন করে এগুলো তো নয়ই। যেমন তালাক সম্পর্কে আমাদের সমাজে দারুন বিভ্রান্তি রয়েছে। আর এ বিভ্রান্তির বলি হচ্ছে নারী। সঠিক পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে যৌতুকের কারণসহ আর্থিক দৈন্যতা পারিবারিক কলহ এবং আরো বিভিন্ন কারণে দেশে প্রতিবছর কয়েক হাজার বিবাহ ভঙ্গ হয়। মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহ ভঙ্গের ব্যাপারে বিপুল জনগোষ্ঠীর স্বল্পজ্ঞান এবং তালাকের মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ সম্পর্কে শরিয়তের বিধান নির্দেশ প্রভৃতি বিষয়ে ফতোয়াদানকারীদের অধিকাংশের অজ্ঞতা ও আমাদের সমাজে বিবাহ ভঙ্গের একটি প্রধান কারণ।

এখনো যেসব ফতোয়ার মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয় সেগুলোকে নিয়ম বহির্ভূত বলে ধরে নেয়া হয়। ফতোয়ার ব্যাপারে প্রথম মিডিয়া রিপোর্ট আসে ১৯৯৩ সালে, মৌলভী বাজার জেলায় ফতোয়ার কারণে এক নারীর মৃত্যু ঘটে। এ ঘটনার প্রতিবাদ হওয়ায় পরের কয়েকটি ফতোয়া সংক্রান্ত ঘটনা ঘটে যায়। এসব ঘটনা

প্রকাশিত হওয়ায় এবারই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, গ্রামের অশিক্ষিত ইমাম অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তি-গোষ্ঠী তাদের কায়েমি স্বার্থ আদয়ের লক্ষ্যে গ্রামের রক্ষণশীল পরিবেশের সুযোগ নিয়ে মহিলাদের হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার করছে। সাধারণত লক্ষ্য করা যায় যে, যেসব মহিলা নিজেদের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে চায় যেমন ঋণ নেয়া, ব্যবসা শুরু করা, বা নিজের জীবন সঙ্গী নির্বাচন করা, তাদের ওপরই এসব ফতোয়া জারি করা হয়। তবে ব্রাক স্কুল গ্রামীন প্রোগ্রাম বা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় সহিংসতামূলক ফতোয়াবাজি করা হয়েছে। গ্রামের গরিব অশিক্ষিত অসহায় মহিলারাই এর শিকার হচ্ছে। দোররা মারা, পাথর ছুড়ে মারা, জুতা দিয়ে মারা, মাথার চুল কেটে দেয়া, গাছের সাথে বেঁধে পেটানো, মাটিতে অর্ধেক পুতে পাথর ছোড়া এসব বিভিন্ন নির্মম, অমানুষিক শাস্তির সামনে অসহায় হয়ে আছে দুর্বল লোকজন। ফতোয়ার শিকার অনেক ক্ষেত্রেই লজ্জায় অবমাননায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশ কমলগঞ্জ থানার ছাতকছড়া গ্রামের দরিদ্র পিতার সুন্দরী, স্বাস্থ্যবর্তী কর্মঠ, স্বাধীনচেতা, আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন মেয়ে নূরজাহান।

১৬ বছর বয়সে বিয়ে হয় চল্লিশোর্ধ্ব এক প্রৌঢ়ের সাথে। চার বছর পর স্বামী-পরিত্যক্তা হয়ে পিতার ঘরে আশ্রয় আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন নূরজাহান কিছুদিন এনজিওতে চাকুরী করে। কিন্তু দরিদ্র পিতা নূরজাহানের আবার বিয়ে দিলেন তথাকথিত সামাজিক নিরাপত্তার তাগিদে। দ্বিতীয় বিয়ের আগে নূরজাহানের

পিতা প্রথম স্বামীর তালাকনামাটি গ্রামের ধর্মীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত দানকারী গ্রাম্য মসজিদের ইমাম সাহেব মওলানা মান্নান (বয়স ৩২) কে দিয়ে পরোখ করিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন যে, এ তালাকনামার বলে তিনি নূরজাহানকে অন্যত্র দ্বিতীয়বার বিয়ে দেতে পারেন কিনা। কাবিননামা পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য "কনসালটেশন ফি" হিসেবে মাওলানা সাহেব ২০০ টাকাও নেন নূরজাহানের দরিদ্র পিতার কাছ থেকে। মাওলানা সাহেবের রায় পেয়ে গ্রামের অবস্থাশালী কৃষক মোতালেবের সাথে নূরজাহানের দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে গেল। গ্রামের প্রভাবশালী মাতব্বরদের সাথে মোতালেবের জমি-জিরাত নিয়ে কোন্দল ছিল। কোন্দলের শিকার করা হল নূরজাহানকে। অবলা অসহায়া নারীর বিচার করা হল গ্রাম্য সালিসে। পঞ্চায়েতের বিচার বসল। সেই বিচার সভায় মাওলানা মান্নানকে দিয়ে ফতোয়া দান করা হল- নূরজাহানের দ্বিতীয় বিয়ে বৈধ নয়। শরিয়তের বিধান মতে নূরজাহান মহাপাতকী হয়েছে দ্বিতীয় বিয়ে করে। বিচারে নূরজাহানের জন্য শাস্তি সাব্যস্ত হল হাঁটু সমান গর্তে দাঁড় করিয়ে নূরজাহানকে ১০১ টি প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করা হবে এবং আর দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করতে পারবে না নূরজাহান।

গত ৩০/০৬/২০১৩ তারিখ পত্রিকান্তরে প্রকাশিত রংপুরের বদরগঞ্জে এক মুফতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন হিল্লা বিয়ে ছাড়া পুনরায় বউ ঘরে তোলা নিষেধ। মুফতির এই ফতোয়ার কারণে এক দম্পতির ৮ বছরের দাম্পত্য জীবন হুমকির

সম্মুখীন হয়েছে। এ কারণে প্রতিকার চেয়ে ইউএনওর কাছে লিখিত আবেদন স্বামী-স্ত্রী।

০২/১১/২০১২ তারিখ ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রাম সালিশে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে গিয়ে স্থানীয় মাতুব্বরদের হাতে বেদম মারপিটের শিকার হয়ে ছামসুন্নাহার (৫০) মারা গেছে। ফতেপুর করঠিকর বাংলাদেশের একটি গ্রাম। ফতোয়ার শিকার নজরুল ইসলাম দিনমজুর। তিনি একদিন রাগের মাথায় তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কথা বলেছিলেন, আর তাতেই গ্রামের মাতবর সেফায়েত উল্লাহ তালাক হয়ে গেছে বলে ফতোয়া দেন, যা সম্পূর্ণ বেআইনি।

ডাসার গ্রামের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সৈয়দ আবুল হোসেনের নিজস্ব মস্‌জিদ চেয়ারম্যান বাড়ির মস্‌জিদের মোয়াজ্জেম জনাব মওলানা মুজিবুর রহমান সাহেব সাক্ষাতকারে অনেক কথা বলেন। প্রথমেই তিনি বলেন যে, আমার বাড়ি বগুড়া জেলার কাহালু থানায়। আমি সিলেটের হযরত শাহ্‌জালালের মুরিদ। এমপি মহোদয়ও তাই। আমাকে এখানে চাকরি দেয়া হয়েছে একই পীরের মুরিদ বলে। এই মস্‌জিদে একই পীরের মুরিদ ছাড়া অন্যান্যরা নামাজ পড়তে আসে না। গত এক বৎসর যাবত আমি এখানে চাকরি করি। এই গ্রামের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা কম হয়। আমি আমার এলাকায় অনেক বিচারকার্য সমাধান

করেছি। চুরি, ডাকাতি, ছেলে-মেয়ে বেআইনীভাবে চলাফেরা করা, এছাড়াও পাড়ার দ্বন্দ্ব, এগুলোতে আমরা মূলত মুরব্বিদের সাথে বসি, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করি, প্রথম বারের মত সচেতন হওয়ার কথাই বলি, সংশোধন না হলে দ্বিতীয় বার শাস্তি স্বরূপ টাকা পয়সার জরিমানাই করা হয়। এখন আর পূর্বের মত শরিয়া মোতাবেক বিচার কেউ করতে চায় না। জনগণ পূর্বের তুলনায় সচেতন হওয়ায় আইনের দারস্থ হয়। ডাসার গ্রামের বিচার ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, এখানে থানার দারোগা একটা নিয়ম করে দিয়েছে। প্রায় প্রতি মাসেই ডাসার ইউনিয়নে ৭২টি মস্‌জিদের ঈমাম এবং মোয়াজ্জেম সাহেবদেরকে নিয়ে বসেন। তাদেরকে এলাকার চুরি-ডাকাতি, সামাজিক বেআইনী কাজ সম্পর্কে জানাতে বলেন। মোবাইল বা বর্তমান আধুনিক বিভিন্ন টেকনোলজি দ্বারা যুবক শ্রেণী কোন অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে কিনা অথবা বাহিরের কোন দেশ বা গ্রামের সাথে কোন ক্রিমিনালী কাজে জড়িয়ে পড়ে কিনা সেই সম্পর্কে তথ্য রাখতে বলে।

ঐ গ্রামেরই মিনার বাড়ি মস্‌জিদের মোয়াজ্জেম জনাব শরীফ হুমায়ুন তার সাক্ষাৎকারে বলেন, আমি আমার চাকুরী জীবনে সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বিভাগে চাকুরী করি। অবসর জীবনে গ্রামে এসে মিনার বাড়ির মস্‌জিদটি নির্মান করেছি। পূর্বের মত আর ছেলেমেয়েরা আমাদের কথায় পাত্তা দেয় না। কথায় কথায় থানায় দৌড় পাড়ে। তবে সত্যি কথা হল থানার দারোগা সাহেব আমাদের নিয়ে প্রতিমাসেই বসেন এবং এই ডাসার ইউনিয়নের আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কে

আমাদেরকে অবহিত করেন। এতে করে ডাসার ইউনিয়নের আইন-শৃঙ্খলা মোটামুটি ভাল।

ডাসার গ্রামেরই একজন মুক্তিযোদ্ধা জনাব সাবের আলী, বয়স ৭০ খুব সুন্দরভাবে সময় নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আমার সাথে কথা বলেন। পূর্বে আমরা জমির ভোগ দখল নিয়ে তেমন কোন কথা বলতাম না। বাড়ির পাশের কোন একখণ্ড জমিতে আমার ভাই অথবা আমার আত্মীয় বা প্রতিবেশী দু হাত বেশী চাষ করলেও সেটা নিয়ে কোন কথা বলতাম না। ভাবতাম আমার নিজের আত্মীয়, নিজের ভাই তাদের সঙ্গে বিবাদ চলে না। জমি-জমার কোন্দল করতে গেলেও দুই পক্ষ একসাথে এক নৌকায় যাতায়াত করতাম। আত্মীয়তার বন্ধনটি অনেক দৃঢ় ছিল। বিবাহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, পূর্বে কোন কাবিন নামা ছিল না, শড়া পড়িয়েই মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে আসতাম। একই গ্রামে আমরা হিন্দু-মুসলমান সব দাওয়াতে যেতাম আসতাম। কখনই সমস্যা হয়নি। ডাসার গ্রামে ফতোয়া প্রথা কখনই প্রচলিত ছিল না। কখনো কোন বিষয়ে সমস্যা হলে নিজেদের মধ্যেই মিমাংসা করে নিতাম।

৬. জ. সুপারিশ

গবেষণার তথ্য সন্ধান ও পর্যালোচনার আলোকে বলা যায় যে, বিরোধ নিস্পত্তির বিকল্প পন্থা হিসেবে সনাতন প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অনন্য। বাংলাদেশের

বর্তমান বিচার ব্যবস্থা দেশের দরিদ্র্য ও নিরক্ষর জনগণের জন্য মোটেই অনুকূল নয়। কৃষি নির্ভরশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র্যকৃত মানুষের আর্থ-সামাজিক দুরাবস্থার প্রতি ন্যায্য সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিরোধ মীমাংসায় সনাতন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সালিশী প্রথায় মুরব্বিদের স্থানীয় ও ঘরোয়া পরিবেশে একত্রিত করে কম সংঘাতময় ও অধিক নমনীয়, ব্যয় সাশ্রয়ী স্বল্প সময়ে দ্রুত কার্যকর ও সহজলভ্য করে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়তা প্রদান করছে। দেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থা বৈধ প্রতিকার বিধানে ব্যর্থ হওয়ায় বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে সালিশীর গুরুত্ব দিন দিনই বেড়ে চলছে।

সালিশকার নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে দ্বন্দ্ব নিরসনের ক্ষেত্রে তত্ত্বকথা পরীক্ষা করেন। সালিশকারকে অবশ্যই পক্ষদ্বয়কে অসংখ্য প্রশ্ন করতে হয় এবং তাদের বাগ-বিতণ্ডার জবাব দিতে হয় পক্ষদ্বয়ের বিরোধ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যকারণের ওপরে জোড়ালো বক্তব্য, বিশ্বাস/অবিশ্বাস ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে হয়। এই সকল প্রশ্ন ও ঘটনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পক্ষদ্বয় তাদের মীমাংসার বিভিন্ন বিকল্প খুঁজে পান এবং তারা ওই সকল বিকল্পের উপরে বাস্তবতামূলক মীমাংসায় পৌঁছাতে সহায়তা পান।

অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বর্তমানে শিক্ষিত যুবক শ্রেণী অংশগ্রহণ করায় বিচার ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় অধিক যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে। তারা সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী, আত্মীয়তাভিত্তিক দল, পরিবার প্রতিষ্ঠান, সভা সমিতি, যারই বিচার কার্য পরিচালনায় যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিচারকার্য পরিচালনা করতে যাতে জনগণ সহযেই সে যুক্তি মেনে নিচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ সুন্দর সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

পূর্বে পুরোহিত ইমাম এবং যাজকগণ খুব কম শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে ধর্মীয় যাজকগণ অনেক বেশি শিক্ষিত। ফলে তাদের জ্ঞানের প্রসারতাও বাড়ছে অনেক। রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি খেয়াল রেখে ধর্মীয় কুসংস্কারকে বাদ দিয়ে প্রগতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তারাও বিচার কার্য করেন।

কোট-কাচারিগুলো মূলত থানা পর্যায় থেকে শুরু। গ্রামের সামাজিক ইউনিটগুলো কোর্ট থেকে অনেক দুরে। ঐসব প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রীয় সাংগঠনিক পর্যায়ে। সেখানে দিন, তারিখ সময়ের ঝামেলা থাকে প্রচুর। অপরিচিত ব্যক্তিদের পক্ষে শুনে কখনই সঠিক বিচারকার্য করা সম্ভব নয়।

আর সমাজে জনগণের পারস্পারিক সম্পর্ক, মেলামেশা, লেনদেনের মাধ্যমে স্বত:স্ফূর্ততার ভিত্তিতে এইসব অনানুষ্ঠানিক গ্রুপ বা দলগুলো সমাজের বিচারকার্য পরিচালনা করেন। যার প্রকৃত ভিত্তিই জনগণ এবং তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক।

এই গ্রুপ বা দলেল মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য থাকে না। এই গ্রুপগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সামাজিকতা, সংবেদনশীলতা, ভাবাবেগহীনতা, বিবেচনা, ব্যক্তি সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, বুদ্ধি বিবেক, চারিত্রিক দৃঢ়তা, আত্ম:বিশ্বাস যৌথ দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা, বিশেষজ্ঞগণ, জনগণের সাথে কাজ করার ক্ষমতা প্রভৃতি।

আমাদের সমাজে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করেন তারা হচ্ছেন, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, পৌরসভার চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড কমিশনারগণ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, মসজিদের ইমাম, মক্তবের শিক্ষক, স্কুলের শিক্ষক, মোল্যা, মৌলবী পীর প্রভৃতি। তারা জনগণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। জনগণ তাদের উপর আস্থাশীল। তারা তাদের নির্দেশ ও উপদেশ মেনে চলে। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সমাজে যথেষ্ট প্রভাব আছে। জনগণ বিয়ে-সাদী ও অন্যান্য সামাজিক এবং ধর্মীয় কার্য সম্পাদনে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে।

শিক্ষক সম্প্রদায়কে জনগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তারাও জনগণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। সাধারণ মানুষ তাদেরকে অনেক ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাই সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে

একসাথে বসবাসের কারণে এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এইসব প্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদা দিনদিনই বাড়ছে।

অধ্যায় ৭

মূল্যায়ন

এই গবেষণায় গ্রাম বাংলার বিভিন্ন দ্বন্দ কলহ, বাদ-বিবাদ, কিভাবে সংঘটিত হয় এবং তা নিরসনে গ্রামের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে ভূমিকা রাখে তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। আধুনিক আদালত বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যতই নৈপুন্য দেখাক না কেন গ্রামীন সাধারণ জনগনের নিত্য নৈমিত্তিক দ্বন্দ-কলহ মিটানোর ক্ষেত্রে সালিশ, মাতব্বর, সর্দার, সমাজপতি, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী যতটা সুষ্ঠু বিচার করতে পেরেছে কোর্ট তা পারেনি। কে. এম. মহিউদ্দিন এবং আরেফিন তাদের সামাজিক গবেষণায় দেখিয়েছেন পূর্বে সমাজের নেতাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কেউ কোন প্রশ্ন করতে পারত না। "চল্লিশের দশক থেকে স্বাধীনতা পূর্ব পর্যন্ত সময়ে গ্রামীন যেকোন সামাজিক কার্য কলাপ পরিচালিত হতো গ্রামের নেতৃস্থানীয় ধনী, শিক্ষিত, জ্ঞানী, গুনী, মাতব্বর, পুরোহিত

সমাজ পতিদের দ্বারা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সামাজিক কাঠামোর অপেক্ষাকৃত তরুণ ও শিক্ষিত নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটলেও তারা ঐতিহাসিক নেতৃত্বেরই বংশধর" (মহিউদ্দিন ১৯৯৯:৮২)।

এই প্রসঙ্গে "বাংলাদেশের গ্রাম" নামক এক গবেষণাধর্মী পুস্তকে পাই যে, "১৯৫০ এবং ১৯৬০ সালে ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্ব দিতেন ঐতিহাসিক প্রধান এবং প্রামানিকরা। ১৯৭০ দশকে এ পরিস্থিতি পাল্টে যায়। গ্রামীন প্রভাবশালী সমাজ ও গোষ্ঠীর অপেক্ষাকৃত তরুণ সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। ১৯৭১ সালের পর গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসূচীর গুরুত্বারোপের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ তার ভূমিকা পরিবর্তন করে। শিক্ষিত গ্রামবাসীরাই এই পরিবর্তিত ভূমিকার সুযোগ নিতে বেশী সমর্থ হয় এবং এরা বেশীর ভাগই সম্পদশালী পরিবারের জ্ঞাতিকুল। ক্ষমতার কাঠামোর এই পরিবর্তন কিন্তু ক্ষমতার উৎসের কোন পরিবর্তন হয়নি। অরীতিবদ্ধ গ্রামীন সংগঠন সমাজ ও সাম্প্রতিককালে সরকারি সংস্থাগুলো একই পরিবারের লোকজনের হাতেই রয়েছে। নতুন প্রাতিষ্ঠানিক নেতারা আসলে ঐতিহ্যিক নেতাদেরই জাতিকুল। শিক্ষা-দীক্ষার কারণে এই যুবকেরা নয়া এজেন্সীসমূহ ও সরকারি সংগঠনগুলিতে তাদের অবস্থান পেতে সক্ষম হয়েছে" (কাজী তোবারক হোসেন, মুহাম্মদ হাসান ইমাম, ১৯৯৪, পৃ. ৭৩)।

A. H. M Zehadul karim তাঁর সমাজ গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, since Independence in 1971 there has been a proliferation of government

programmes targeted at Bangladesh rural communities. These new programmes, including, Cooperatives, work-incentive programmers and social welfare Units. Provide new opportunities for villagers to exercise power in the community. In fact, the leaders in these programmes come from the politically powerful samaj. While there is a change in the actual leaders, who are now the educated sons of the pradhans and Parmaniks, of the control of power is even more concentrated in the hands of the old elites [Karim 1990:10].

বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজে ক্ষমতা ও নেতৃত্ব বহুলাংশে ঐতিহ্য নির্ভর। জ্ঞাতি সম্পর্কিত মর্যাদাগোষ্ঠী এবং ভূমি মালিকানার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঐতিহ্যগতভাবেই গ্রাম পর্যায়ে "বাংলাদেশে বৃহৎ ভূমিগোষ্ঠী" নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। ঐতিহ্যগতভাবে এই ধরনের নেতারাই গ্রামীন সমাজের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে আসছে। তবে সম্প্রতি নেতৃত্বের এই ঐতিহ্যিক ধরনের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সরকারি ও আধাসরকারি গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পগুলো গ্রামে কাজ করার কারণে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ও এর একটি impact লক্ষ্য করা যায়। রাস্তাঘাট নির্মান, ব্রীজ কালভার্ট মেরামতের ক্ষেত্রে যত্ন, স্থানীয় সরকারের local govt. এর মাধ্যমে infrastructural development I road development এর কাজ করছে। এইসব কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন কমিটিতে নিজেদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে তারা গ্রামে নেতৃত্ব অর্জন করতে চেষ্টা করছে। Food for works program এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রামে রাস্তাঘাট নির্মান ও Construction এর দায়িত্বে নিয়োজিত। এইসব কাজে resource

distribution ও patronage distribution এর মাধ্যমে গ্রামে বর্তমানে এক শ্রেণীর নেতা তাদের follower তৈরি করতে সক্ষম হয় BRAC, RSS এবং অন্যান্য সমাজসেবামূলক কার্যক্রমগুলো পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে তারা গ্রামে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। সম্প্রতি শিক্ষা বিভাগ ও UNICEF তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে স্কুলে পরিচালনা কমিটি ও Parent-Teacher Association গুলোর সাথে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন কমিটি করেছে। এই কমিটিগুলোতে গ্রামের নেতাদের অন্তর্ভুক্তি নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পরিবর্তন আছে বলে লক্ষ্য করা যায় (হোসেন, ইমাম, পৃ. ৭৫)।

আশির দশকের শেষ দিকে বাংলাদেশে কিছু কিছু এন. জি.ও (গণসাহায্য সংস্থা, গ্রামীন ব্যাংক, প্রশিকা, আশা, ব্রাক, লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, আসক) গ্রামীন দরিদ্রদের সচেতন ও সংগঠিত করে । গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামোয় এবং সামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহনের সুযোগ করে দিয়েছে। এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময়ে গবেষণার এলাকায় (ডাসার ইউনিয়নে) মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশনের (এন.জি.ও) বহু মাঠ কর্মীর সাথে আমার দীর্ঘ আলাপ আলোচনা এবং তাদের বিচার কার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহন করি। আমাদের গ্রামীন সমাজব্যবস্থায় গ্রামের মাতব্বর এবং মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা অনানুষ্ঠানিকভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন একই কার্যক্রম আনুষ্টানিকভাবে (Official System) এ গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় বিচার করে।

লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশনের পরিচালক জনাব ফজলুল হক সাহেব তার সাক্ষাতকারে প্রথাগত আইন আদালতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন কোন এক স্ত্রীলোকের গলা থেকে ছিনতাই কারী চেন ছিনতাই করল-স্ত্রীলোকটি থানায় এসে পুলিশকে অভিযোগ করে চলে গেলেন। পুলিশ বর্ণনা অনুযায়ী ছিনতাই কারীর কাছ থেকে চেনটি উদ্ধার করলেন। চেনটি সে নিজে কুক্ষিগত করলেন-এই জবাবদিহিতা কার কাছে দিবেন? এখানেই আমাদের সামাজিক বিচার ব্যবস্থা এবং নিয়মিত আইন আদালতের সাথে পার্থক্য। বাংলাদেশের আর একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আইন ও সালিশ কেন্দ্র একই সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা শহরে অবস্থিত কিন্তু সমাজের সকল স্তর থেকে আসায় নারীদের সামাজিক হেনস্থা (বিবাহ বিচ্ছেদ, শিশুদের ভরণ-পোষণ, নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ প্রভৃতি মানবীয় অধিকার) সম্পর্কে বিচার কার্য পরিচালনা করেন। তারা দক্ষ উকিলের মাধ্যমে নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদ যৌতুক খোরপোশ বিষয়গুলো কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করেন। এসিড নিক্ষেপ, হত্যা, গুম, ছিনতাই, ধর্ষণ, অপহরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আদালতের শরণাপণ্য হন।

এন, জি, ও সমূহের কর্মসূচীর ফলে গ্রামীন সালিশি কাঠামোয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করে তাদের সমস্যা আলোচনা করছে। এবং সমাধানের ক্ষেত্রে তৈরির প্রয়াস শুরু করে। গ্রামের সাধারণ জনগণ খুব ভালভাবেই বুঝতে পারে যে, কোর্ট বিচার ব্যবস্থায় বিবাদির পক্ষে বা বিপক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট রায়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। এ যাবৎকাল বিভিন্ন সামাজিক গবেষক দেখেছেন যে, যখনই সমাজের অভ্যন্তরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার

বিরোধী, ভাইয়ে-ভাইয়ের বিরোধী, ছেলে-বাবা কিংবা মাকে খেতে দিচ্ছেনা, মারপিট, গাছের মালিকানা, ফসল দখল বা চুরি: মেয়ে ঘটিত বিষয় সংক্রান্ত বিরোধী, সময়মতো কিংবা চুক্তিমতো মজুরী না দেওয়া, গাছ কেটে ফেলা নারী নির্যাতন, সন্ত্রাসী ঘটনা, পরিবারের অভ্যন্তরে মনোমালিণ্য, বিরোধ ইত্যাকার বিষয় সমূহে যখনই মিমাংসায় আসার চেষ্টা করে তখনই গ্রামের মাতব্বর সালিসদার এবং জ্ঞাতি গোষ্ঠীদের ডাক পড়ে এবং তাদের দ্বারাই মিমাংসা করে। মহিউদ্দিন তার সামাজিক গবেষণার কিছু অংশ তুলে ধরেছেন, "হাজিপুর ও তিনপাড়া গ্রামে ১৪ জন মাতব্বরের মধ্যে প্রধান মাতব্বর আলী যেভাবে গ্রামের বিভিন্ন বিরোধী মীমাংসা বা নিস্পত্তির চেষ্টা করতেন, গ্রামের জনগণ এবং অন্যান্য মাতব্বরা তা সুন্দর ভাবে মেনে নিতেন। গ্রামের জনগণ আলীর ভূমিকাকে সম্রাটের তুল্য মনে করতেন (মহিউদ্দিন, ৮৬-৯৯)। আতিউর রহমান, তাঁর সামাজিক গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, গ্রাম্য সামাজিক কাঠামো ধরে রাখার ক্ষেত্রে মাতব্বর জ্ঞাতি এবং গোষ্ঠী প্রধানদের ভূমিকা মুখ্য" (রহমান, ৬২-৮৯)। এই গবেষণা চলা কালীন সময়ে ডাসার ইউনিয়নের পশ্চিম কমলাপুর গ্রামের চেহারুন বেগম জন্ম থেকেই তার খালাত ভাই হানিফ হাওলাদারের ঘরে বসবাস করছিলেন। গ্রামের অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কেউই জানতো না চেহারুন হানিফ হাওলাদারের নিজের বোন নয়। ২০১২ সাল থেকেই তার খালাত ভাইয়ের সঙ্গে টাকা পয়সার লেনদেনের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেয়। এ নিয়ে কয়েকবার বাক-বিতন্ডা হলে, চেহারুনকে ঘরথেকে বের করে দেয়। শীত গ্রীস্ম বর্ষা সবই চেহারুনের অন্যের ঘরের বারান্দায় কেটে যায়। অনেকবারই চেহারুন গ্রামের সালিশদারদের সহযোগিতা চায় কিন্তু কোন ভাবেই সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না। অবশেষে এলাকার সবচেয়ে বৃদ্ধ এবং গন্যমাণ্য ব্যক্তি

দেলোয়ার হাওলাদার (বয়স-৭৫) চেহারুনদের আত্মীয় স্বজনদের ডাক দেন এবং সবার সামনে চেহারুনের খালাত ভাইদের সাথে বসবাসের সব অবস্থান বর্ণনা করেন। জ্ঞাতি ভাই হানিফ হাওলাদার এলাকার ১নং ওয়ার্ড মেম্বার সমস্যার সমাধান করেন এবং চেহারুনের খালাত ভাই এই বলে মেনে নেন যে শুধু মাত্র জ্ঞাতি ভাইদের মান রক্ষায় চেহারুনকে মেনে নিলাম।

বিভিন্ন এন.জি.ও কার্যক্রম এবং বর্তমান জনকল্যাণ মূলক সরকার ব্যবস্থায় গ্রাম্য জনগণ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন হয়েছে, শিক্ষিত হয়েছে। তাই সরকার ব্যবস্থাতেও গ্রাম্য উন্নয়নের জন্য রয়েছে পদক্ষেপ। আর. এম ম্যাকাইভার এই পদক্ষেপকে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বলে উল্লেখ করেছেন।

নোবেল বিজয়ী ড. ইউনুস গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশ মূলত গ্রামগুলোর সমর্থিত একটি দেশ। সবগুলো গ্রামের সমস্যা যোগ করলে সেটা বিরাট হয়ে দাঁড়ায়। অথচ সমস্যাগুলোকে ছোট আকারে গ্রামের পর্যায়ে নিয়ে আসলে সেটাকে আর ভয়ানক মনে হবে না। গ্রামের ছোট ছোট সমস্যাগুলোর সমাধান স্থানীয়ভাবে করে ফেলতে পারলে দেশের সমস্যার আয়তন অনেক কমে যাবে। ড. ইউনুস এই সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রাম সরকারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর তাঁর শাসনামলে গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ-এর সরকার তা বাতিল করলেন। তাঁর আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়

উপজেলা ব্যবস্থা। বেগম খালেদা জিয়া-এর সরকার এসে উপজেলা বাতিল করে দিল। শেখ হাসিনার সরকার এসে করলো গ্রাম পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদকে ৯ ভাগে বিভক্ত করেছে। গ্রামকে যদি আমরা সবল করতে চাই, তাদের নিজস্ব সেবাকে যদি কাজে লাগাতে চাই, তাদের সমস্যার যদি সমাধান চাই তাহলে তার উপযোগী কাঠামো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরি করতে হবে। তথ্য প্রযুক্তিকে আয়ত্বে আনতে পারলে গ্রামের বিচ্ছিন্নতা কেটে যাবে। গ্রাম তার নিজস্ব সংজ্ঞায় গ্রাম হয়ে উঠবে" (ইউনুস, পৃ. ৪৮, ২০১০)।

১৯৭৬ সালে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন অধ্যাদেশ জারি হয়। গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্যই মূলত স্বায়ত্ব শাসন ইউনিট হিসাবের ইউনিয়ন পরিষদের যথেষ্ট গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়। ১৯৫১ সালে জামিদারী উচ্ছেদের পর হাট বাজার সমূহ সরকারের রাজস্ব বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়। দেশের স্বাধীনতার পর দায়িত্ব অর্পন করা হয় গণ কমিটির উপর। জিয়া সরকার যুব কমপ্লেক্সের উপর হাট বাজারের দায়িত্ব অর্পন করেন। গ্রামীন শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় চাষাবাদ, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, হাসপাতাল তৈরি বা মেরামত প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অনন্য। গ্রামীন শান্তি শৃংখলা বিধানেও ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব যথেষ্ট ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের একটি সংগঠন হলো গ্রাম্য আদালত। ১৯৭৬ সালের গ্রাম্য আদালত অধ্যাদেশ দ্বারা গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রাম আদালত ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীন পরিচালিত। স্থানীয়ভাবে পল্লী অঞ্চলের সাধারণ মানুষের বিচার প্রাপ্তির কথা বিবেচনায় নিয়ে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে প্রণীত হয় গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ। গ্রাম

আদালত আইনের মূলে যাই হলো স্থানীয় ভাবে স্বল্প সময়ে বিরোধ নিস্পত্তি। গ্রামের সাধারণ জনগণ যেন সামান্য বিষয় মিমাংসার জন্য মহাকুমা বা তদুর্ধ্ব পর্যায়ের আদালতে না এসে সহজে বিচার পায় এজন্যই গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠিত। মহাকুমা বা উর্ধ্ব পর্যায়ের আদালত জটিল আইনের প্রশ্নে জড়িত মামলাসমূহের প্রতিই বেশী গুরুত্ব প্রদান করে, সামান্য স্বার্থ জড়িত মামলা সমূহে কম নজর দেয়। ফলে তাদের মাসের পর মাস হয়রাণি হতে হয়। এই সুযোগে উকিল মোক্তার এবং টাউট শ্রেণীর লোক বিশেষ ফায়দা লুটে। কিন্তু গ্রাম আদালতের মাধ্যমে জনসাধারণ অতি অল্প সময়ে এবং কম খরচে সহজে বিচার পায়।

ইউনিয়ন পরিষদ যদিও একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি সদস্য কোন না কোন পাড়া কোন ওয়ার্ডের প্রতিনিধি, চেয়ারম্যান কয়েকটি গ্রামের প্রতিনিধি। একান্ত জনগণের কাছের লোক, কারো আত্মীয় কারো জ্ঞাতি ভাই, কারো প্রতিবেশী, কারো বংশের প্রধান। তাই যখন নবগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বাবু রুহিদাস মন্ডলের সাথে প্রচলিত আইনব্যবস্থা এবং গ্রাম বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলতে যাই তিনি দৃঢ় কণ্ঠে প্রচলিত আইন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গিয়ে বলেন, "আমি স্বাধীনতার পরে তিন তিন বার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছি। আমার সাথে বহু মন্ত্রী, ডিসি, থানার দারোগা-পুলিশের সাথে ওঠা-বসা ছিল। আমাদের গ্রাম সম্পর্কে যখন কোন অপরাধমূলক কাজ নিয়ে থানা অথবা উপজেলায় গিয়েছে। উপরোক্ত অফিসারগণ আমার শরনাপন্ন হয়েছে এবং আমার উপর সমস্ত বিচারের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। আমি আমার প্রতিনিধিগণ নিয়ে দেখা করলে অফিসারগণ বলেছেন, যতক্ষণ আপনারা আপনাদের নিজেদের দায়িত্ব

সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন ততক্ষণ আমরা আপনাদেরকে বিরক্ত করবো না। পর পর কয়েকটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান একইভাবে সাক্ষাৎকারে বললেন আমাদের গ্রামে থানা-পুলিশ কখনো ঢুকতে দেই না।

প্রচলিত বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় প্রবাদ বাক্য আছে, æJustice delayed is justice denied" গ্রাম্য জনগণ প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক, ভুল বুঝাবুঝির অবসান, দীর্ঘ-বৈরিতা এড়ানো, ভবিষ্যত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, দুশ্চিন্তা লাঘব করা, দরিদ্র অসহায় জনগোষ্ঠীর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, অর্থ ব্যয় না করে দ্রুত সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য বিচার ব্যবস্থার বিকল্প পথ হিসেবে গ্রাম্য সালিশ, সভা, সমিতি, মিটিং-এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম বলে গন্য করেন।

এই প্রসঙ্গে উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য, æExorbitant costs, excessive delays and backlogs and a lack of knowledge or resources are major obstacles to those who seek justice in formal legal settings" (Siddiqi, 2003: 4)। বিকল্প বিচারের ব্যবস্থা সমাজকে গণতান্ত্রিক, সুষ্ঠূ ও সুন্দর, সকলের অংশীদারিত্ব, মানবিক মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রেখে, সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধকে জাগ্রত করতে সহায়তা করে। সামাজিক শ্রেণী, গোত্র বর্ণ বিভক্তির অবসান ঘটিয়ে, সামাজিক শিক্ষা, আদেশ-উপদেশ, সামাজিক শিষ্ঠাচার শেখা ও অনুশীলনের ক্ষেত্র স্থাপন করে মানুষ হিসেবে সমমর্যাদার শিক্ষা, ব্যক্তির জীবন থেকে ক্রোধ, হিংসা দূর করে এবং ব্যক্তির আচরণ

পরিবর্তন করে ভবিষ্যত বিরোধ এড়ানোর এবং সামাজিক উন্নয়ন সমুন্নত করে সর্বপ্রকার উৎপাদন বাড়াতেও সহায়তা করে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বক্তব্য, æFor many years an auxiliary system of conflict resolution, known widely as Salish, has existed in many rural communities in Bangladesh. With some variations based an socio-economic status and cultural norms, the indigenous informal justice system has been in practice for quite a long time" (Muhammed 1978: Adnan 1975).

Through this system, village elders or other respected community members were called upon to provide unbiased advice and frequently offered judgments, taking into account the needs of the community as a whole.

গ্রাম্য সালিশকারগণ মূল সমস্যাসমূহ সহজ করে বিচারকার্য করেন, মানবিক প্রয়োজনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে গঠনমূলক প্রতিকার দেন। অতীত নয় ভবিষ্যতে কল্যাণের কথা বোধ চিন্তা করে, বিবাদরত পক্ষকে মানবিক হতে সাহায্য করে, সমস্যাসমূহ সামগ্রিকভাবে দেখার ব্যবস্থা, বিবাদরত দলকে অপমান না করে শ্রদ্ধা রেখে উভয় পক্ষকে সমান চোখে দেখে লুকায়িত সমস্যার সমাধান করেন। নিরব ব্যক্তিকে সজাক এবং বাচাল ব্যক্তিকে শান্ত রাখে। মনের পরিবর্তন এনে সুষ্ঠু মীমাংসার সহায়ক হয়, বস্তুনিষ্ঠ ও আবেগপ্রবণ সত্য পকাশ পায়। রায় নয় উপদেশ দেয়া হয়। বল প্রয়োগ নয় আভ্যন্তরীনভাবে মানসিক চাপের মাধ্যমে মীমাংসার ব্যবস্থা করা হয়। উভয় পক্ষ রাজী না হয়ে পারে না।

উভয় পক্ষই লাভবান হয়। উভয় পক্ষের আবেগ ক্রোধ ইচ্ছা প্রকাশ পায়। এতে ভবিষ্যত কলহ এড়িয়ে নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বিচার কার্যের সময় উপমা বা উদাহরণ দেয়ার জন্য নিজেদের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতে পারেন।

As there is no formal administrative unit at the village level, within their natural boundaries this system provides social administration to the people in many Bangladesh village and indeed, in many communities throughout South Asia. As a traditional non-court-based dispute resolution mechanism operating at a local level it plays the role of a formal guardian for the villagers (Barman 1988). More precisely, it is a means of resolving conflict between individuals, family members co-workers and others about issues such as tineage, land disputes, neighborhood and community issues, unlawful activities, non-cooperation, etc. that take place in rural society (Mohiuddin 1999).

পরিশিষ্ট – ১

প্রশ্নপত্র

প্রশ্নমালা প্রশ্নপত্র .....

১। পরিবার প্রধানের নাম ঃ

২। ধর্ম (নির্দিষ্ট করে লিখুন) ঃ বর্ণ ঃ

৩। বয়স (বছর) ঃ

৪। পেশা (নির্দিষ্ট করে লিখুন) ঃ

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নিরক্ষর / অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন / (নির্দিষ্ট করে লিখুন) ঃ

৬। বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত / অবিবাহিত / বিধবা / বিপত্নী / পরিত্যাক্ত ঃ

৭। (বিবাহিত হলে) ঃ কত বছর বয়সে বিয়ে করেছেন, ... বছর।

৮। মাসিক আয় (টাকায় লিখুন) ঃ

৯। পরিবারের ধরন ঃ একক / যৌথ / ভঙ্গুর।

১০। পরিবারের সদস্য সংখ্যা (এক পাতিলে খায়) ..... জন।

১১। ছেলে / মেয়ের সংখ্যা ঃ মেয়ে ..... জন, ছেলে ..... জন।

১২। বাড়ীর ভিটা জমির পরিমান ..... শতাংশ।

১৩। নিজস্ব জমির পরিমান (ভিটার জমি বাদে) ..... শতাংশ।

১৪। বর্গা চাষের জন্য অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হতে জমি নিয়েছেন কি? হ্যাঁ / না।
* (হ্যাঁ হলে) ঃ বর্গাকৃত জমির পরিমান ..... শতাংশ।

১৫। বর্গা চাষের জন্য অন্য কোন ব্যক্তির নিকট জমি দিয়েছেন কি? হ্যাঁ / না।
* (হ্যাঁ হলে) বর্গাকৃত জমির পরিমান ..... শতাংশ।

১৬। টাকার বিনিময়ে কোন ব্যক্তির নিকট হতে জমি বন্ধক নিয়েছেন কি? হ্যাঁ / না।
* (হ্যাঁ হলে) ঃ কত টাকায় ..... কত শতাংশ ..... জমি।

১৭। টাকার বিনিময়ে কোন ব্যক্তির নিকট হতে জমি বন্ধক দিয়েছেন কি? হ্যাঁ / না
* (হ্যাঁ হলে) ঃ কত টাকায় ..... কত শতাংশ ..... জমি।

১৮। খাবার পানি হিসাবে কোথাকার পানি ব্যবহার করেন? টিউবওয়েল / পুকুর / কুয়া।

১৯। কি ধরনের পায়খানা ব্যবহার করেন? পাকা / স্ল্যাব / কাচা।

২০। কতজনে এ পায়খানা ব্যবহার করেন? ..... জন।

২১। পরিবারের ঘরের সংখ্যা কয়টি? ..... টি।

২২। ঘরের ধরন ঃ পাকা / টিনের / ছনের / কাচা।

২৩। ২০০১ সনের ১লা জানুয়ারি থেকে আজবধি আপনি বা আপনার পরিবারের কোন সদস্য কোন দ্বন্দ্ব কলহে জড়িত ছিলেন বা হয়েছেন কি? হ্যাঁ / না।
* (হ্যাঁ হলে) ঃ কি ধরনের ব্যাখ্যা করুন .....
(কি নিয়ে দ্বন্দ্ব) ঃ

২৪। বিচার / সালিশ / কেচ / কোথায় দিয়েছেন? কোর্ট / থানা / চেয়ারম্যান / মেম্বার / সমাজপ্রধান / ধর্মীয় প্রধান / অন্যান্য।

২৫। দ্বন্দ্ব নিরসনে ফলাফল কি হয়েছে তা লিখুন ঃ

২৬। ২০০১ সনের ১লা জানুয়ারি থেকে আজবধি আপনি অন্য কাউকে ঝগড়া / দ্বন্দ্ব কলহ করতে দেখেছেন কিনা? হ্যাঁ / না।
* ঝগড়ার কোন কোন পার্টি অংশগ্রহণ করেছে? .....
* নিরসনের মাধ্যম কাহারা? .....
* নিরসনে কত সময় লেগেছে? সময় (.....)
* কি কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে? .....

পরিশিষ্ট – ২

চেক লিষ্ট

১। নিজে কখন ও কোন বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিনা? .....

২। নিজে কোন দ্বন্দ্বে / কলহে জড়িত না থাকা সত্ত্বেও গ্রামের কোন দ্বন্দ্ব-
* গ্রামের বাইরে- পাশের গ্রামের কোন লোকজন এই গ্রামে এসে দ্বন্দ্ব কলহ করেছে কিনা-
বর্ণনা করুন .....
দেখেছেন কিনা- বর্ণ করুন।

৩। আপনি কি মনে করেন দ্বন্দ্ব কলহ নিরসনে- প্রতিষ্ঠান / স্কুল / কলেজ / মাদ্রাসা / মন্দির / ক্লাব ভূমিকা রাখে কিনা / ন্যায্য করে কিনা হ্যাঁ / না।

৪। আপনি কি মনে করেন দ্বন্দ্ব কলহ নিরসনে ধর্মীয় প্রধান সঠিক বা ন্যায্য বিচার করে? হ্যাঁ / না।

৫। আপনি কি মনে করেন দ্বন্দ্ব কলহ নিরসনে সমাজ প্রধান / ধর্মীয় গুরু / জ্ঞাতি বা গোষ্ঠী প্রধান সঠিক বা ন্যায্য বিচার করে? হ্যাঁ / না।

৬। আপনি কি মনে করেন দ্বন্দ্ব কলহ নিরসনে মেম্বার / চেয়ারম্যান সঠিক বা ন্যায্য বিচার করে? হ্যাঁ / না।

৭। বিচার ব্যবস্থা নিরসনে সনাতন প্রতিষ্ঠানগুলো যথেষ্ট কি না, আপনার মতামত জানান .....

৮। সনাতন প্রতিষ্ঠানগুলোর বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

পরিশিষ্ট – ৩

গ্রন্থপঞ্জি – বাংলা

অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (সম্পাদিত), 'গৌড় লেখমালা,' রাজশাহী, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৩

আখতারুজ্জামান, ড. মোঃ, *বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ধারণা ও আইন এবং আইনগত সহায়তা প্রদান আইন*

আরেফিন, হেলাল উদ্দিন খান, *শিমুলিয়া বাংলাদেশের আইন পরিবর্তনশীল কাঠামো*

আরেফিন, হেলাল উদ্দীন খান (১৯৮২), *বাংলাদেশের কৃষিবিন্যাস*, ঝড়পরধষ ঝঃঁফরবং (শিমুলিয়া গ্রাম)

আরেন্স, ইয়েনেকা ব্যুরদেন, ইওসফান (১৯৯৮), *ঝগড়াপুর, গ্রামবাংলার গৃহস্থ ও নারী*, পপুলার প্রিন্টিং এজেন্সী, ঢাকা

আলম, মুহম্মদ সাইফুল, *দ্রুত বিচার বিষয়ক আইন*

আব্দুল, অধ্যাপক মোঃ, *গ্রামীণ সমাজ ও রাজনীতি* [সমাজ বিজ্ঞান, সেমিনার]

আহমদ, সালাহ্উদ্দিন, *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন ১৮১৮-১৮৩৫*

ইসলাম, ড. মোঃ নুরুল, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা*

উদুদ, কাজী আব্দুল, *বাঙালি মুসলমান সমাজ*

ওয়াইজ, জেম্স (১৮৭৪), *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, প্রথম ভাগ

করিম, প্রফেসর মোঃ বজলুল, *শিক্ষা ও প্রশাসনে মন্দির মসজিদের ভূমিকা*

করিম, সরদার ফজলুল (১৯৯৯), *এরিস্টটল এর পলিটিক্স*, বাংলাবাজার, ঢাকা

কাজী এবাদুল হক, বিচরার ব্যবস্থার বিবর্তন, পৃ: ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬।

খান, ইসরাইল (১৯৮৯), *বুদ্ধিজীবীদের দ্বন্দ্ব ও সাহিত্য সমাজে অবক্ষয়*, সৃজনী প্রেস এন্ড পাবলিকেসন্স লিঃ, ঢাকা

খালেক ও এ ইউ আহমেদ (১৯৯৬), *মন ও মনোবিজ্ঞান*, ঢাকা

ঘোষ, নির্মলকান্তি (১৯৯৫), *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, মহাবিদ্যা প্রেস, কলকাতা

চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত কালী নারায়ন (১৯৯৭), *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, অনু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা

চৌধুরী, ড. আনোয়ার উল্লাহ, *বাংলাদেশের একটি গ্রাম সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি সমীক্ষা*

জানসেন, এরিক, জি (১৯৯০), *গ্রামীন বাংলাদেশ সীমিত সম্পদের প্রতিযোগিতা*, সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান (১৯৯৩), *বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও শ্রেণী সংগ্রাম*, সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

দাশগুপ্ত, অমল (১৯৯৫), *মানুষের ঠিকানা*, শ্রী সত্য নারায়ন প্রেস, কলকাতা

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন: উয়ারী বটেশ্বর, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান, ঢাকা ১৯৮৯, পৃ. ১০-১৩।

বর্মন, রেবতী (১৯৮৭), *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, এ্যাম্পায়ার প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

বাকী, আবদুল (১৯৯৮), *গ্রামীন বসতি*, প্রেসিডেন্সি প্রেস, ঢাকা

বার্টুচি, *প্রাগুক্ত*

বেগম সাহিদা, *মুসলিম আইন ও পারিবারিক আদালত*

বিকল্প ব্যবস্থার অনানুষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা ।

ভূইয়া, ড. মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ (১৯৮৬), *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, হাবিব প্রেস লি., ঢাকা

মহাভারত ১. ১০৪, ৯-৫৫

মহিউদ্দিন, কে এম (১৯৯৯), "গ্রামীন সালিশে দারিদ্র জনগণের অংশগ্রহণ ঃ এনজিওর ভূমিকা পর্যালোচনা", *সমাজ নিরীক্ষন (৭৩)*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

রহমান, আতিউর (১৯৮৯), *গ্রামীন ক্ষমতার কাঠামোর রূপান্তর ও মাতবরদের অবস্থান*, সমাজ নিরীক্ষন (৩২), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

রহমান, প্রফেসর ড. এস এম জিল্লুর (১৯৯৯), *বাংলাদেশের গ্রামীন জ্ঞাতিত্ব*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুর (১৯৮৮), *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, হাসান প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

রহমান হোসেন জিল্লুর, *মাঠ গবেষণা ও গ্রামীন দারিদ্য*

রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৯৯৮), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাচীন যুগ, কলিকাতা

শশিকর (১৯৯৬), *শশিকরের ইতিহাস ভিত্তিক প্রকাশণা*, মুক্তি প্রিন্টার্স প্রেস, ঢাকা

শরীফ, আহমদ (১৯৯৮), *স্বদেশের স্বকালের সমাজের চলচিত্র*

শ্রী অতুল সুর, বাংলার সামাজিক ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ১১

সরকার, নীহার রঞ্জন (১৯৯১), *মনোবিজ্ঞান ও জীবন*, জ্ঞান কোষ পাবলিশার্স, ঢাকা

সাবাহ, সালেহ (১৯৭৭), *গ্রামীন শ্রমজীবী নারী*, ১/এ/১, রিং রোড, ঢাকা

সেনগুপ্ত, প্রমোদ বন্ধু (১৯৯২), *মনোবিদ্যা*, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা

সেন্দেল, ভেলাম ভান (১৯৯৯), *ত্রয়ী বদ্বীপ*, গ্রামীন বার্মা, বাংলা ও দক্ষিন ভারতে পুঞ্জীভবন ও দারিদ্র সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র, ঢাকা

সুপ্তিকনা মজুমদার – বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজ।

হক আমিরুল, *বন্দক গ্রাম*, ঢাকা

হক, কাজী এবাদুল (১৯৯৭-৯৮), *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*

হবীবুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ (১৯৭৭), *শিল্প ও মনবিজ্ঞান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হোসেন, খোন্দকার শওকত (১৯৯২), *বাংলাদেশের উপন্যাস গ্রামীন সমাজ*, পপুলার পাবলিশার্স, ঢাকা

পরিশিষ্ট – ৪

Bibliography

æAlternative Dispute Resolution by Early Judicial Intervention: A Possible Way out of Delay and Backlog in our Judiciary" by Professor M. Shah Alam.

Abdulla, Abu (1976), æLand Reforms and Agrarian Change in Bangladesh", *The Bangladesh Development Studies,* IV, 1: 67-114

Abdullah, Abu Mosharaf Hossain and R. Nations (1974), SIDA/ILO *Report on Integrated Rural Development Programme (RDP),* Bangladesh (Mimeo)

Abearian, Gilbert and Monte Palmer (1974), *Society in Conflict: An Introduction to Social Science,* Sanfrancisco: Canfield Press

Abedin, Najmul (1973), *Local Administration and Politics in Modernising Societies: Bangladesh and Pakistan,* Dhaka: National Institute of Public Administration

Adnan, Shapan et al (1975), æThe Preliminary Findings of a Social and Economic Study of Four Bangladesh Villages," *The Dhaka University Studies,* XXIII (Part A): 111-127

Adrian, Charles A (1960), *Social Science and Community Action,* East Lansing: Institute for Community Development and Services

Ahmed, Imtiaz, *Terrorism in the 21st Century: Perspective from Bangladesh*

Akash, M. M. (1980), æBangladesher Gramin Samajer Swarup: Ekty Punarnirikshan" *Samaj Nirikshan,* 3: 40-73

Alam, Manjur-ul (1976), Rural Power Structure and Co-operatives in Relation to Modernisation of Agriculture: A Comparative Case Study of Five Villages", M. Amerul Huq (ed.), Exploitation and the Rural Poor-A Working paper on the Rural Power Structure in Bangladesh, Comilla: Bangladesh Academy for Rural Development, Pp. 215-236

Ali, A. M. M. Shawkat, *Faces of Terrorism in Bangladesh*

Bailey, F. G. (1960), *Tribe Caste and Nation,* Manchester University Press

Barman, Dalem Ch. (1983), *Emerging Leadership Pattern in Rural Bangladesh* (Unpublish Ph.D. Thesis, 407-535)

Berocci, Peter J. (1974), *Research Manual, Dhaka: Bangladesh Rural Advancement Committee*

Berocci, Peter J. (1974), *The NET-Power Structure in Ten Village's,* Dhaka: Bangladesh Rural Advancement Committee

Beteille, Andre (1965), Caste, Class and Power: Changing Patterns of Social Stratification in a Tunjore Village, University of California.

Brown, G. G. and J. H. Barnet (1942), æSocial Organization and Social Structure", in American Anthropologist, 31

Chowdhury, Anwarullah, *A Bangladesh Village: A Study of Social Stratification,* Dhaka: Centre for Social Studies

Chowdhury, Shah Nazrul Islam and M. A. Jabbar (1979), æDevelopment Orientation of Local Government in Bangladesh: The Case of Union Parishad, æin The Bangladesh Journal of Agricultural Economics, 2, 1 (June): 1-22

Chowdhury, Sirajul Islam, *Middle Class and the Social Revolution*

Clark, Terry N (1972), æThe Concept of Power: Some Overemphasized and Underrecognized Dimensions: An Examination with Special reference to the Local Community," in Charles H. Bonjean. Tery N. Clark and Robert L. Lineberry (ed.), Community Politics-A Behavioural Approach, New York: The Free Press

Costa, Thomas, *Chaining Power Structure in Rural Bangladesh*

D. C. Sircar, Epigraphic Discoveries in East Pakistan Calcutta, 1973, pp. 19ff.

Das, B. Q., *Criminology (theoretical) in Bengali,* First Volume, Kamrul Book House, Second Print, July 2001, P. 316-317

Dasgupta, Biplab (ed.) (1967), *Village Studies in the Third World,* Delhi: Hindustan Publishing Corporation

Fairchild (ed), Henry Pralt, *Dictionary of Sociology*

Franda, Marcus (1981), æZia-ur-Rahman and Bangladeshi Nationalism," in Economic and Political Weekly XVI (10-12): 357-380

Gerth, H. H. and C. W. Mills (ed.) (1946), From Max Weber: Essays in Sociology, New From Max Weber: Essays in Sociology, New York: Oxford University Press

Government of Bangladesh (1981), 1980 Statistical Yearbook of Bangladesh, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Ministry of Planning

Haque, Khandaker Rashedul, *Local Level Governance: A Study of INstitutional Interaction between Union Parishads and Non-government Organization,* 352 HAL, C-1

Hossain, Abul, *Formations, Functions and Active of Leadership,* P. 125

Hossain, Abul, *Growth in a Bangladesh Village*

Islam, A. K. M. Aminul (1974), A Bangladesh Village: Conflict and Cohesion An Anthropological Study of Politics. Cambridge: Schenkman Publishing Company

Islam, Sirajul (1978), Bangladesher Bhumi Bebastha O Samajik Samasya, (Land System and Social Problems in Bangladesh), Dhaka: Centre for Social Studies

Kabir, Mohammad Gulam (1980), Minority Politics in Bangladesh, New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

Kamalkanata Gupta (ed) Copperplates of Sylhet, 1967, pp. 95-152

Karim, Nazmul A. K. (1956), *Changing Society in Indian and Pakistan,* Dacca, Ideal Publications

Khan, Samsul Arefeen Helaluddin, *Chaining Agrarian Structure in Bangladesh*

Kuper, Adam Kuper and Jessica Kuper, The Social Science Encyclopedia New Fetter Lane, Lenden, Ec4p, 4EE

Marx, Karl (1971), Capital: A Critique of Political Economy, Vol III, Book III (The Process of Capitalist Production as a whole, edited by F. Engles, 4th Impression). Moscow: Progress Publishers

N. G. Majumder (de) Inscriptions of Bengal, vol. iii, Rajshahi 1929, pp. 140

ND, *Who Gets What and Why? Resource Allocation in a Bangladesh Village,* Dhaka: Bangladesh Rural Advancement Committee

Nicholas, R., Village Factions and Political Parties in Rural West Bengal in Journal of Commonwealth Political Studies, vol. 2.

Nurang and R. C. Dhawan, *Introduction to Social Science,* 1980, p. 57-58

P. C. Rao, Alternatives to Litigation in India in Alternative Dispute Resolution: What it is and How it works, P. 25.

Rahim, Mohammad A (1963), 1 (1201-1576), Karachi: Pakistan Historical Society

Rahman, A. T. R., Basic Democracies at the Grass Roots: A Study of Three Union Councils of Comilla Kotwali Thana, Comilla: Pakistan Academy for Rural Development

Rahman, Dr. Mijanur, æAlternative Dispute Resolution," Human Rights Summer School Manual, September, 2007, p. 148.

Rahman, M. Shamsur (1980), æPolitical Consciousness in a Rural Community of Bangladesh: A Case Study of Hatinda Village in the District of Rajshahi," in Local Government Quarterly, 9 (1-2): 39-54

Ramaranjan Mukherjee and Sachindra Kumar Maity (ed) Corpus of Bengal, Inscriptions, Calcutta, 1967, pp. 244

Rashid, Harun-or, *Conflict of Cultures,* Lessons from Bosnia

Rashid, Salim, *The Clash of Civilization*

Rashid, Salim, *Women and Human Security in South Asia: The Case of Bangladesh and Pakistan*

Rowshan Ara (2004), A Philosophico-social, Analysis of the Concept of Leadership with Special Reference to Youth Development in Bangladesh At the Grass-Root Level, p. 117

Sarvesh Chandra, ADR: Is Conciliation the Best Choice? In Alternative Dispute Resolution: What it is and how it works, P. 83.

Sk. Golam Mahbub, Alternative Dispute Resolution in Commercial Disputes: The UK and Bangladesh Perspectives (2005), P. 2.

Tom Arnold, Mediation Outline: A Practical How – To Guide for Mediators and Attorney's in Alternative Dispute Resolution, P. 212.

Warington John (Edited and Translated) (1959), Aristotle's Politics and Athenian Constitution, London, J. M. Dent and Sons Ltd.

Weber, Max (1947), The Theory of Social and Economic Organization, (Translated By A. H. Henderson and Talcott Parsons) New York: The Free Press of Glencoe.

White, D. M., æThe problem of power" in British Journal of Political Science, 2: 479-490

Zaidi, S. M. (1970), The Village Culture in Transition: A Study of East Pakistan Rural Society, Honolulu: East West Center Press

পরিশিষ্ট – ৫

পত্রিকা এবং জার্নাল

মেহের, গ্রামোন্নয়নে নেতৃত্বের ভূমিকা – পঞ্চগ্রাম নমুনা বিশ্লেষণ, একটি অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আবেদা সুলতানা, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ১৯৯৭ এবং নারীর ক্ষমতায়ন ঃ চারটি ইউনিয়ন পরিষদের উপর একটি বিশ্লেষণ (১৯৯৭-২০০৩)।

পারভীন সুলতান, মানবাধিকার সনদ ও ইসলামে নারীর অধিকার ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

মুহাম্মদ আবু ইউসুফ, বাংলাদেশের সমাজে ধর্মের ব্যবহার, অপব্যবহার, অসদ্ব্যবহার ১৯৯১-২০০১, একটি রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

Journal of the Asiatic Society of Bengal, part I, 1896, pp. 6ff.

Bangladesh Lalitokala, Journal of the Dacca, Museum, vol. 1, p. 80.

The Daily Star, April 29, 2007.

The Daily Star, 6 July, 2008.